( উপন্যাস )

শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য

( এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট )

প্রণীত।

সন ১৩৩৪ সাল।

 [ এক টাকা চারি আনা।

প্রকাশক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য বি, এ,
সি, টী, এজেন্সী,
১, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা,
বাঁশরী প্রেস,
২৪৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

# উৎসর্গ-পত্র

দেব-কল্প, অশেষ-গুণাধার, মহা-প্রাণ মদীয় মধ্যমাগ্রজ,

স্বর্গীয় বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের পবিত্র স্মৃতিপূজায়

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

কলিকাতা,
মহেন্দ্র ভবন।
১লা ভাদ্র,
সন ১৩৩৪ সাল।

শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য।

# ভূমিকা।

আমার দুই একজন বন্ধু এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া ধারণা করিয়াছিলেন যে এই গ্রন্থের বর্ণিত ঘটনাবলী সত্য-ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই পুস্তকের সমস্ত বিবরণ একেবারে কাল্পনিক। কেহ নামের কিম্বা স্থানের কোনরূপ ঐক্য দেখিয়া অন্যরূপ মনে না করেন, ইহাই মিনতি।

পুস্তকের প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কন কালে আমি আমার অনুজ শ্রীমান্ গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, বি, এর নিকট অনেক প্রকারের সাহায্য পাইয়াছি—তজ্জন্য তাহার নিকট একান্ত ঋণী।

কলিকাতা,<br>
১লা ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল।

শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য।

# বিষ-পান

## সূচনা

কে আমার ঘুম ভাঙ্গালে ? কেন আমার ঘুম ভাঙ্গলো ? কেন আমার অনেক দিনের পর এই নিদ্রা শেষ নিদ্রা হ'ল না ? তা হ'লে আমার প্রধান যন্ত্রণাদাতা, স্মৃতি, আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে আসতে পারতো না ! আবার আমাকে অনুতাপের তপ্ত তৈলে ফেলতে ভুলতে পারত না ! কি করে এই স্মৃতির হাত এড়ান যায় ! কি করে সেই স্ত্রী-হত্যার, পুত্র-হত্যার কথা আমি ভুলতে পারি ? কে আমাকে সে সব অমানুষিক ব্যাপার ভুলিয়ে দিতে পারে ? আমি সেই অতীত মহাপাপের কথা কি করে ভুলতে পারি ? আমি আমার সব দিতে প্রস্তুত—আমার ইহকাল, পরকাল, এমন কি আমার অস্তিত্ব, আত্মা,—যদি তার বিনিময়ে আমি একটী জিনিষ পাই—বিস্মরণ ! আর যে পূর্ব্বকৃত পাপের স্মৃতি-দংশন সহ্য হয় না ! আমার কঠিন প্রাণ যে তার আঘাতে একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেছে ! কেন তা একেবারে লোপ পায়না ? এই যে আমার হারু ! বাছার জীর্ণশীর্ণকায়, মলিন বেশ—দেখতে যেন রাস্তার ভিখারীর ছেলে ! বাছার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা পড়ে গা ভেসে যাচ্চে, অনাহারে, অবহেলায়, কষ্টে, দুঃখে, বাছার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না!

আমাকে যেন কত কথা বলতে চায়, কিন্তু বলতে পাচ্চে না! আমাকে দেখে তার প্রাণের দুঃখ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে। তার জীবদ্দশায়, আমাকে না দেখে তার প্রাণ কি পর্য্যন্ত কাতর হয়েছিল তা' বল্‌তে চাচ্চে, কিন্তু বলতে পাচ্চে না! আহা! বাছা আমার, যাবার আগে আমাকে কত খুঁজেছিল, কিন্তু একবারও দেখা পায় নাই। এমন নিষ্ঠুর পিতার অমন স্নেহবান্ পুত্র হয়? বিধাতঃ! তুমিই জান তোমার বিচিত্র লীলা! আমার বাছার শেষ কথা মনে আছে; বাছা, "বাবা" "বাবা" বলতে বলতে জীবন ত্যাগ করেছে। আমি এমন পশু, যে একবৎসরের মধ্যে তার একবারও খোঁজ লই নাই। আমি তখন নিজের সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলাম; আমার নিজের আত্মজের কথা ভাববার সময় পাই নাই! সে আছে কি নেই, কেমন আছে, খেতে পাচ্চে বা না পাচ্চে তা' খোঁজ লওয়া উচিত বলে মনে করি নাই। আহা! বাছাকে যখন শেষ ছেড়ে আসি, তখন বাছা আমার কত কান্নাই কেঁদেছিল। আমাকে কিছুতে আসতে দেবে না; বলেছিল; "বাবা! যেও না, আমাকে ছেড়ে যেও না, আমি তাহ'লে মরে যাবো।" আমার দুটী পা জোর করে ধরেছিল। তার বিশ্বাস ছিল, যে সে ক্ষুদ্র বাহুর বলে আমাকে ধরে রাখতে পারবে, কিন্তু আমি তার কোন কথা গ্রাহ্য করিনি, তার মুখের দিকে ভাল করে চাইনি; পাছে প্রাণে মায়া হয়, পাছে সেদিন দেশ হতে না আসতে পারি। স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় বাছা আমার কি কষ্টই ভোগ করেছিল! আমি নিয়মিত টাকা দিতুম না, বাছা ভিখারীর পুত্রের ন্যায় আধপেটা খেয়ে থাকত, শতগ্রন্থি মলিন কাপড় পরত! বাছার মুখে তখনই যেন সহস্র শোকের বিষাদের ছায়া পড়েছিল। বাছার হাসিতে যেন শতকষ্টের কালিমা মাখান

থাক্‌ত! বাছার বালকসুলভ স্ফূর্ত্তি-প্রণোদিত চপলতার উপরে কষ্টভারাক্রান্ত চিন্তাশীলতা এসেছিল। আমাকে দেখে তার কি উল্লাসই হয়েছিল! প্রথমে খানিকক্ষণ আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারেনি যে তার বাবা আবার এসেছে। কতকক্ষণ একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে ছিল। তার পর ছুটে এসে হাঁটু ধরে মুখখানি পায়ের মাঝখানে কতক্ষণ রেখেছিল—কোন কথা কইতে পাল্লে না। একটু পরে কত কথা জিজ্ঞাসা কল্লে। আমি ত তার সত্য উত্তর দিতে পারিনি। আহা! বাছা কত কষ্টে, কত বেদনার স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, "বাবা, তুমি এতদিন কোথায় গিয়েছিলে? কে তোমায় চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল? কে তোমায় আসতে দেয় নাই?" কত বালককে কতবার বলে বেড়িয়েছিল, "আমার বাবা এসেছে"—যেন তার চেয়ে প্রয়োজনীয় ঘটনা পৃথিবীতে কখন ঘটেনি। বালকেরা সে সংবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্যক বুঝতে পারেনি বলে যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নও হয়েছিল। এমন স্নেহশীল পুত্রকে আমি কি অযত্নে, কি দুঃখে রেখেছিলাম! আমিই তার একমাত্র মৃত্যুর কারণ। যদি নিষ্ঠুর হননকর্ত্তা তাহার বধের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়, তাহ'লে আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি তার অপেক্ষা শতগুণে দায়ী ব্যাঘ্র-প্রকৃতি নরহত্যাকারী পশুও তার শত্রুকে অত কষ্ট দিয়ে মারে না। এক বৎসরের প্রত্যেক দিন তার জীবনের সূত্র একটু একটু করে ছিঁড়েছি! ওঃ কি ভয়ানক পাপ! কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা! স্মৃতি! হয় তুমি তোমার অনলে আমাকে পুড়িয়া ফেল, না হয় আমার কাছ থেকে চিরকালের মত চলে যাও! আবার কে তুমি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে? চক্ষু কোটর হতে বেরিয়ে পড়ছে, ঘাড় একদিকে বেঁকে গিয়েছে, কেশ আলুথালু হয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর ফুলে

গিয়েছে, গা হতে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে! ওঃ! বুঝেছি, তোমাকে চিন্তে আমার বেশী দেরী লাগেনা—দেরী লাগবার কথাও নয়। তুমি সেই—যার জন্য আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা। এই যে আমি এই হেদোর ভিতর বসে আছি, পরণে কুক্কুরেরও ঘৃণ্য শতগ্রন্থি দুর্গন্ধময় মলিন বস্ত্র, আকারে পথত্যক্তপত্রোৎকীর্ণ অন্নভোজী, বিকৃত-মস্তিষ্ক, রক্তচক্ষু উন্মাদ—এসব তোমারই হতে! এই যে, তোমার পাশে সে কুক্কুরটা এসে দাঁড়াল—যার সঙ্গে গোপনে তোমার প্রণয় চলেছিল। গলা ফুলে উঠেছে—আবার যদি পাই ত, দ্বিতীয়বার হত্যাসুখ অনুভব করি। আমিত আচারে, চরিত্রে, দানব হয়েছি! বালকেরা প্রাতঃভ্রমণে এসেছে; কেউ আমাকে দেখে ভয়ে ভয়ে ফিরে চলে যাচ্ছে, কেউ গাত্র হতে দুর্গন্ধ পাবার ভয়ে দূর হতেই নাসিকায় বস্ত্র দিচ্ছে, কেউ দৃষ্টির অযোগ্য বলে আগে হতেই আমার দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিচ্ছে! হায়! যদি আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতাম, যদি কাচ ও হীরকের পার্থক্য জানবার ক্ষমতা থাকত, হৃদয়ে পুরুষের বল ধরতাম, তাহলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন? তাহলে কেন আমি আমার একমাত্র পুত্রকে হারাব? নরহত্যা, স্ত্রী-হত্যার পাপে লিপ্ত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াব? মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তায় যখন কুকুর মারবার প্রথা আছে, তখন আমার মত মানুষ-কুকুর মারবার প্রথাও থাকা উচিত। জানিনা, আমার ভাগ্যে আরও কি আছে। এই অর্দ্ধ-বিকৃত-মস্তিষ্কে আরও কত পাপ করতে হবে! এই অর্দ্ধ-বয়সে যা করেছি, তাতে এক আত্মা শতজন্মের জন্য অধঃপতিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক যুবকের অপরিপক্ক বয়সে প্রলোভন ও অবিবেচনা হতে নিজেকে রক্ষা করা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। নিজের মনের বেগের দাস হওয়া কতদূর বিগর্হিত তা আমার হীন জীবনের ঘটনা সকল

বিবৃত করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। সেই উদ্দেশ্যে আমার জীবনী, হতভাগ্যের জীবনী হলেও, আপনাদের সম্মুখে বিবৃত করতে সাহসী হলেম।

---

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করি। পিতার নাম কালিদাস মিত্র। সামান্য চাকরি ব্যতীত তাঁহার কিঞ্চিৎ পৈতৃক বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। আমি অল্প বয়সে মা হারাইয়াছিলাম ও পিতার এক বিধবা ভগ্নীর যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। পিতামাতা, জানিনা কি মনে করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন, করুণাময়। কিন্তু জীবনের ঘটনা হইতে যাহা প্রতীত হয়, তাহাতে বিপরীত নাম রাখিলেই ঠিক হইত। আমার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পিতার অবস্থা তত ভাল না থাকিলেও তিনি আমাকে আদৌ তাহা জানিতে দিতেন না। আমি ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জানিতাম ও মনে মনে গর্ব্বও করিতাম যে আমি একজন সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের পুত্র। আমার সহপাঠিরাও আমাকে তাই বলিয়া জানিত। আমি বাল্যকালে গ্রামস্থ স্কুলেই বিদ্যাভ্যাস করিতাম। পড়াশুনাতে ভাল বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল। পিতা ও শিক্ষক মহাশয়েরা আমার বেশ লেখাপড়া হইবে বলিয়া আশা করিতেন। পল্লীগ্রামস্থ স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিলে প্রায়ই মনের গঠন যেরূপ হইয়া থাকে তাহা আমার হইয়াছিল। আমি হিন্দু সামাজিক আচার ব্যবহার সকল দেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতাম; হিন্দুর গার্হস্থ্যনীতি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া জানিতাম; হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।

স্কুলের সহপাঠীর মধ্যে আমি একজন হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়া (staunch) সমর্থক বলিয়া পরিগণিত হইতাম। জাতিবিচার সমাজের পক্ষে মঙ্গল-প্রদ, বিধবার বিবাহ-নিষেধ—উচ্চনৈতিক-জ্ঞানপ্রসূত, মূর্ত্তিপূজা মানবের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা ছিল।

চিত্তে এই সকল ধারণা পোষণ করিয়া আমি প্রবেশিকা পাশ করিয়া I.A. পড়িতে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় আসিয়া যেন এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার নূতন সহাধ্যায়ীর মধ্যে অনেক "কল্‌কেতার ছেলে" ছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণ, ধর্ম্মনীতি বিষয়ে ধারণা, সকল শুনিয়া আমার প্রাণে যুগপৎ বিরক্তি, ঘৃণা ও আতঙ্ক উপস্থিত হইত। তাহারা ধর্ম্মকর্ম্ম, সামাজিক নীতি-বিষয়ক কথা মুখে আনা ঘোর গ্রাম্যত্বের পরিচায়ক মনে করিত। অর্থোপার্জ্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা প্রকাশ করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। তাহাদের মুখে অর্থোপার্জ্জনের নানা উপায় শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। ভাবিতাম, যাহা তাহাদের সমবয়স্কের মস্তিস্কে কখনও প্রবেশ করে নাই, তাহা তাহারা কিরূপে এরূপ সম্যক ভাবে আয়ত্ত করিল। তাহাদের মুখে অর্থোপার্জ্জনের শুধু স্থূলনীতি সকল শুনিতাম না—ব্যবসায়কুশল ব্যবসায়ী-জ্ঞানাতীত সূক্ষ্ম-পন্থা সকলেরও আভাস পাইতাম। ভাবিতাম, এরা কি স্কুলে না পড়িয়া দোকানে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। বিপরীতধারণামুগ্ধ আমিও অর্থকে ও অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণকে প্রাণ ভরিয়া অযথা ঘৃণা করিতাম। লেখাপড়া শিক্ষা অর্থোপার্জ্জনের জন্য, একথা বলায় শিক্ষার যত অবমাননা হয় ইহার অপেক্ষা আর কিছুতে বেশী হইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। হায়! তখন জানিতাম না যে অর্থ বিনা স্ত্রীর ভালবাসা পাওয়া যায় না; সংসারের ধর্ম্মকর্ম্ম

কিছুই করা যায় না; মানুষ, মানুষ হয় না; সময়বিশেষে পরিচিত ব্যক্তির হঠাৎ স্মৃতিলোপের আশঙ্কা থাকে না।

কেহ কেহ আমাকে ও আমার মতকে বিদ্রূপ করিত। বেশীর ভাগ ছাত্রেরা এটা পাড়াগেঁয়ে ছেলের শিক্ষার অভাব মনে করিয়া কিছু বলিত না। উহাদের মধ্যে একটী বালকের সহিত আমার অনেক বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলেও বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। তাহার সহিত সখ্যভাবে নানাবিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক চলিত। তাহার নাম বিমল। বিমল খাঁটি কল্‌কেতার ছেলে—তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নমুনা; তাহার প্রকৃতিতে নগরের বিলাসপ্রিয়তা ও সৌখীনতা, পল্লীগ্রামের হৃদয়বানতা ও সরলতা, পূর্ণরূপে প্রকাশিত ছিল। তাহার বেশভূষার যেমন পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা, অন্তরেও তেমনি বিশুদ্ধতা ও রমণীয়তা। বেশভূষার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি থাকিলেও তাহাকে "বাবু" বলা যাইতে পারিত না; বস্তুতঃ সে বাবুয়ানাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। আমাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। প্রায় ছয় মাস আমরা এক শ্রেণীতে পড়িয়াও পরস্পরের সহিত একটী কথারও আদানপ্রদান করি নাই। প্রথমে আমার প্রকৃতিগত ধর্ম্মপ্রভাবে আমি তাহার বিষয় না জানিয়াও তাহার সম্বন্ধে একটী মনগড়া ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম। আমি তাহাকে একটি কলিকাতার নির্ম্মম, বিদ্রূপপ্রিয়, অহঙ্কারী, বাবু-ছেলের আদর্শ বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম; সুতরাং তাহার সহিত আলাপ করিতে যাওয়া অনুচিত ও অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

একদিন টিফিনের সময় বাল্য-বিবাহ লইয়া আর একটী সহপাঠীর সহিত উত্তেজিত ভাবে তর্কবিতর্ক হইতেছিল। প্রকৃত বিষয়

হইতে আমরা উভয়েই অনেক দূরে যাইয়া শুধু দুজনকে বাক্যে ও বিদ্রূপে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। যেমন হইয়া থাকে, আমাদের তর্কবিতর্ক ব্যক্তিগত ভাব ধারণ করিয়াছিল। আমরা উভয়েই উত্তেজিত। দুই চারিজন সহপাঠীও মজা দেখিতেছে ও পরস্পরকে উত্তেজিত করিতেছে। এমন সময়ে সেখানে বিমল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাকে তাহার দিকে লইবার জন্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দুই-চার কথা বলিল। আমার মনে প্রবল ইচ্ছা যে বিমল আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে একটী কথা কহিলেই আমি তাহার প্রতি আমার ঘৃণা দেখাইবার সুযোগ পাইব। কিন্তু সে সুযোগ হইল না। বিমল যে উত্তর দিল, তাহা হইতে আমার, তাহার সম্বন্ধে ধারণা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অতি মধুর ভাবে, তর্কের সময় বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া ব্যক্তিগত শ্লেষবর্ষণ করা কিরূপ শিক্ষার অভাবের লক্ষণ তাহা বুঝাইয়া দিয়া, বিষয়ের গুরুত্ব জানাইয়া, উভয় পক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা সংক্ষেপে অতি নম্রতার সহিত বলিয়া, আমার উপর এরূপ এক শক্তি বিস্তার করিল যে আমি তাহার চরিত্রের মধুরতা, ন্যায়-পরতা ও বিচারশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পরদিন হইতে দেখিলাম কি এক অজ্ঞাতশক্তিপ্রভাবে আমাদের ক্লাসের উভয়ের সাধারণ স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—তাহা পাশাপাশি না হইলেও মধ্যের ব্যবধান অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা অনেক বাড়িতে লাগিল। যদিও সহরের "আপনি" যাইয়া পাড়া-গেঁয়ে "তুমি" এখনও আসে নাই, তথাপি আমাদের মধ্যে কতকটা বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়াছিল বলিতে হইবে। এইরূপে দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতে, একদিন দশটার সময় ক্লাসে গিয়া

দেখি যে বিমল আমার স্থানের পার্শ্বে স্থান লইয়াছে। সেই দিন হইতে যতদিন সেই ক্লাসে পড়িয়াছি, ততদিন আমাদের স্থান ঠিক সেই জায়গায় ছিল। আমাদের মধ্যে সখ্যতাস্থাপন হইয়াছে। বিমলের সহিত সখ্যতা, আমার জীবনে যেন নূতন ভাব সিঞ্চন করিয়া আমাকে ক্রমে ক্রমে স্বাধীন চিন্তা-তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, তাহার সন্নিকটবর্ত্তী কারণ না হইলেও, তাহার সহিত যে দূর সংশ্রব নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার জন্য যে বিমল কিছুমাত্র দায়ী নহে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এই বর্ত্তমান নৈতিক-অধঃপতনের দুর্গন্ধময় হ্রদে ডুবিয়া থাকিলেও, কখন কখন বিনয়ের সহিত নির্ম্মল সখ্যতার স্মৃতি, স্বর্গের ফুল্লনবরশ্মির ন্যায় আমার অন্ধকার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিমলের সহিত সখ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, জাতি-বিচার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। পূর্ব্বের নৈতিক রক্ষণশীলতার স্থানে স্বাধীন চিন্তাশীলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করিল। এখন মনের পূর্ব্ব মানসিক অবস্থাকে আমি যথার্থ উৎকর্ষহীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম। আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইতাম, যে এতদিন কি করিযা এরূপ "অন্ধকারে" বাস করিতেছিলাম। যেমন চিরবদ্ধ পশু কখন মুক্তি পাইলে, উদ্দামতায় নিজ পূর্ব্ব-অবস্থাকে অপমানিত করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ চিন্তার স্বাধীনতার আস্বাদনে, একরূপ নূতন ভাবের তরঙ্গে চালিত হইয়া, আমার মন বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক নিরাপদ অবলম্বনভূমি হইতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

আমার সহিত সখ্যতাস্থাপনের কিয়ৎদিন পরে বিমল আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কোথায় গেল, তাহার আর কোন সন্ধান ছিল না। বহুবৎসর পরে আবার তাহার সহিত দেখা হয়। তাহার দ্বারাই আমার তখনকার প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে চক্ষু উন্মুলিত হয়। বিমল যে আমার প্রলোভনকারিণীর কে, তাহা আজও অবগত নহি। শুধু সে কি কেবল তাহার পরিচিত ব্যক্তি, কিম্বা কোন নিকট আত্মীয় তাহা আজও জানিতে পারি নাই, জানিবার আর কোন আশাও নাই। কিন্তু তাহার মধুর স্মৃতি ক্ষীণ হইলেও এখনও স্পষ্টভাবে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইবার পরেই পিতা আমার বিবাহ দেন। আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, সে বিবাহে আমার আদৌ মত ছিল না। কারণ আমি শুনিয়াছিলাম যে কন্যা বড় সুশ্রী নয়। এরূপ কারণে আমার বিবাহে মত না থাকার নিমিত্ত অনেক যুবক পাঠকগণ আমাকে নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিবেন। এরূপ বয়সে সকলেরই ইচ্ছা হয় স্ত্রী অনিন্দ্যসুন্দরী হইবে। আমার বিবাহে অমত, লজ্জায় পিতাকে জানাইতে পারিতাম না কিন্তু এরূপ লোকের কাছে প্রকাশ করিতাম যে তাঁহার কর্ণে পৌছান নিশ্চিত। কিন্তু দেখিলাম, তিনি আমার বিবাহের সহিত আমার ব্যক্তিগত মতামতের আদৌ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিলেন না। আমার বিবাহের দিন স্থির হইল। আমি মনের সহিত অনেক সংগ্রাম করিয়া শুদ্ধ গুরুজনের তাড়নার ভয়ে অগত্যা রাজি হইলাম। শুভ-দৃষ্টির সময় দেখিলাম যে আমার স্ত্রীর আকৃতির আমার এতদিনের কল্পিত চিত্রের সহিত আদৌ মিল নাই।

মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। যাহা হউক, আমার মনের ভাব বড় প্রকাশ পাইল না। আমার মানসিক বিমর্ষতা, কালোচিত লজ্জাশীলতার মধ্যে পরিগণিত হইল। বাসরঘরে অনেকে "বউ" পছন্দ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিল কিন্তু আমার নিকট হইতে কোন স্পষ্ট উত্তর পাইল

না। পরদিন বন্ধুদের সহিত দেখা হইল, তাহারাও ঐ প্রশ্ন করিল এবং ঐরূপ অস্পষ্ট উত্তর পাইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রথমবার আমার স্ত্রী আমাদের বাটীতে কয়েকদিন মাত্র ছিল। এই কয়েকদিনের মধ্যে বহু স্ত্রীলোক নববধূ দেখিতে আসিল। উহাদের মধ্যে প্রৌঢ়ারা আমার স্ত্রীর মানসিক ক্লেশের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, তাহার রূপের নিন্দা করিল। কেহ বলিল "ছেলের যুগ্যী বউ হয়নি।" কেহ বা অনুপ্রাসের ঘটা ছড়াইয়া বলিল, "হরের পাশে যেন কালী" ইত্যাদি। এইরূপ নিষ্ঠুর তুলনা শুনিয়া মনে মনে বড় বিরক্তির সঞ্চার হইল। আমার স্ত্রীর মনঃপীড়ার জন্য তাহার উপর সহানুভূতি আসিল। ফুল-শয্যার-দিন রাত্রে স্ত্রীর সহিত প্রথম কথা কহিবার অবসর পাইলাম। ভাবিয়াছিলাম, আমার নববধূ, দৈহিক সৌন্দর্য্যের আতিশয্য না থাকায় আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্টতার ভাব দেখাইবে, কিন্তু সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হইলাম। বহু প্রশ্নের পর বহু চেষ্টা করিয়া এক একটী কথার উত্তর পাইলাম। দেখিলাম, স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা নিজ জাতির মর্য্যাদা রক্ষণে সবিশেষ পটু। সে রাত্রে আমার স্ত্রীর ব্যবহারে আমার মন এককালীন কালিমাযুক্ত হইল। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি স্ত্রীর নিকট আশানুরূপ সুরূপ ও গুণবান নহি।

আমার, তাহার মন জয় করিবার ইচ্ছা যেমন বলবতী হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটী বিরক্তি ভাবও আসিল। আমার বালিকা স্ত্রী অবশ্য আমার মনের ভাব কিছুই জানিতে পারিল না। আমার মনে হইল, তাহার রূপ যে শ্রেণীর হউক না কেন, তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ হওয়া উচিত ছিল। কেন সে আমার

সাহত মন খুলিয়া কথা কয় না? কেন বহু প্রশ্নের পরও একটী জবাব দিতে অত নারাজ? অত গুমোর কিসের? আমি তাহা হইতে কোন্ অংশে হীন যে আমাকে সর্ব্বদা তাহার তোষামোদ করিতে হইবে? এইরূপ বালক-সুলভ বহু প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উদয় হইত। কখন কখন মনে করিতাম, সে তাহার অল্প-ভাষিতা লজ্জাশীলতার জন্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপর বন্ধুদের স্ত্রী সম্বন্ধে গল্প মনে পড়িত। তাহারাও ত বাঙ্গালীর মেয়ে, তাহারা ত তাহাদের স্বামীর সহিত ওরূপ ব্যবহার করে না। কখন মনে হইত যে তাহার কথা মনে আনিব না। কিন্তু তাহাতেও সক্ষম হইতাম না। তাহাকে মন হইতে দূর করা যেন বিশেষ কষ্টকর মনে হইত; অথচ তাহার ব্যবহারের কথা মনে হইলে শুধু হৃদয়-পীড়াই হইত। আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম; অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম এই সমস্ত অনর্থের কারণ শুধু স্ত্রীর উচ্চ শিক্ষার অভাব। আমার স্ত্রীর শিক্ষা অবশ্য পদ্যপাঠ প্রথম ভাগের সীমা অতিক্রম করে নাই; ভাবিলাম, উচ্চ শিক্ষা পাইলে স্বামীর কাছে এরূপ বিগর্হিত লজ্জাশীলতা দেখাইত না, মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিত। আরও একটি ধারণা আমার মনঃকষ্টের বিশেষ কারণ ছিল। আমার মনে হইত, আমার স্ত্রী আমার মানসিক দুর্ব্বলতা জানিতে পারিয়াই যেন আমার উপর অন্যায় সুবিধা গ্রহণ ও বিরাগের ভাব প্রদর্শন করে। এই অহেতুক বিশ্বাস, আমার প্রাণ অত্যন্ত অশান্তিময় করিয়াছিল। নিজের দুর্ব্বলতা অন্যের জ্ঞাত হওয়ায় দুর্ব্বলচিত্ত লোকের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও কেহ তাহার সুবিধা লইতেছে জানিতে পারিলে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে।

যাহা হউক কালের ক্রমান্বয় ঘর্ষণে আমার চিত্ত দৈনন্দিন ক্লেশ ও অশান্তিতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাহাতে আমার আর বিশেষ কষ্ট বোধ হইত না। সে সকল যেন আমার দৈনিক অপরিহার্য্য কার্য্যকলাপের মধ্যে দাঁড়াইল। আমরা দুজনে-দুজনকে বুঝিয়া লইয়া অর্দ্ধপথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালীর অপেক্ষা আমি পরিণয় অক্ষক্রীড়ায় কম সৌভাগ্যবান-ছিলাম বলিয়া নিজেকে বিবেচনা করি নাই।

এইরূপে বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর যেরূপে দিন কাটে আমারও সেরূপ কাটিতে লাগিল। এখন আমার একটি পুত্র হইয়াছে। সে এখন আমাদের দুজনের মধ্যে একমাত্র বন্ধন। হারু আমাতে অত্যন্ত আসক্ত। মাতার সংকোচশীল প্রকৃতির অনুপূরক স্বরূপ যেন সে অত্যন্ত বহুভাষী হইয়াছে। প্রথম হইতেই মাতা অপেক্ষা আমাতে সে অধিক অনুরক্ত। আমার স্ত্রী যেরূপ নিজ মনো-ভাব প্রকাশ করিতে অত্যন্ত কৃপণতা করিত, হারু ঠিক তদ্বিপ-রীত প্রকৃতির। সে আমার উপর মমতা দেখাইবার নিমিত্ত, সর্ব্বদা সর্ব্বরকমে, কথায় ও কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। ওইটুকু দেহে এত বড় হৃদয়, আমি কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইলে, তাহার কি না আনন্দ হইত! সে তার বালক-সুলভ কার্য্যকলাপ সমস্ত ভুলিয়া যাইত; খেলাধুলা সমস্ত ত্যাগ করিত; যতদিন আমি থাকিতাম, দিবারাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। কিসে আমার আনন্দ হইবে তাহা লইয়া সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিত। শুনিয়াছি, বাড়ী হইতে আসিবার দুই তিন দিন পর্য্যন্ত সে একরূপ আহার বিহার ত্যাগ করিত ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া থাকিত। আমার উপর স্নেহের আতিশয্য

থাকিলেও হারু কখনও বিবেচনাহীন কার্য্য করিত না। আমার কলিকাতায় পুনরাগমন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সে আসিবার সময় ক্রন্দনে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিত না, নীরবে আমার গৃহত্যাগ সহ্য করিত। কখন সে আসিবার কালীন আর্ত্তনাদ করে নাই। শুধু একদিন করিয়াছিল, যেদিন আমি শেষ তাহাকে প্রতিবেশী-হস্তে দিয়া নিষ্ঠুরভাবে ছাড়িয়া আসি; সেদিন সে ওরূপ চীৎকার করিয়াছিল কেন এখন তাহা বুঝিতে পারি। হারু বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার পিতার সহিত এই শেষ দেখা—তাহার পিতা যে সর্ব্বনাশের গিরিশিখরে উঠিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার নিম্নপতন নিকটবর্ত্তী। সে বোধ হয় মনে করিয়াছিল যে তাহার পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিলে সে তাহার পিতার ধ্বংসের পথ রোধ করিতে পারিবে।

আমি এখন বি, এ, পাশ করিয়াছি। বৎসর দুই চাকরীর বৃথা অন্বেষণে কাটিয়া গিয়াছে। চাকরিরূপ দুর্ল্লভ মুক্তার উদ্ধারে বিফল মনোরথ হইয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকের শেষ অবলম্বন—ওকালতি—করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি। এখন বি, এল্‌এর লেক্‌চার attend করিতেছি। মেসে থাকি; সকালে একবার দুই এক ঘণ্টার জন্য অধ্যাপকের লেক্‌চারে উপস্থিতি দিতে হয়; বাকি সময় ঘুমাইয়া, খোসগল্প করিয়া ও নভেল পড়িয়া কাটাই। অনেক সময় থাকাতে, আমাকে অনেক রকম বেগার দিতে হইত। তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—প্রথম, আমার বি, এল্, ক্লাসের অনুপস্থিত বন্ধুদের মিথ্যা "উপস্থিতি" বলা; দ্বিতীয়তঃ, যাহারা private tution করিত তাহাদের অনুপস্থিতে সত্য সত্য উপস্থিতি দেওয়া। বলা বাহুল্য, দুই কাজই আমার সমান

রসহীন বোধ হইত। আমাদের বি, এল্, ক্লাসের রেজেষ্টারীতে ৩৯৯ জন ছাত্রের নাম ছিল ও প্রত্যহ ৩৯০ জনের নামে উপস্থিতি বলা হইত। কিন্তু ৯০ই জনের বেশী ছাত্র কোন দিনই আমার জ্ঞানতঃ হাজির হয় নাই। অধ্যাপকগণ ও অধ্যক্ষ এসব যে জানিতেন না, তাহা নয়; তাঁহারা জানিয়াও বোধ হয় ছাত্রদের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় প্রথম সোপানজ্ঞানে এইরূপ ব্যবহারে নীরব থাকিতেন। আমার বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে বিদেশে মাষ্টারি, অনেকে ডাক্তারি, অনেকে চাকরী করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে বি, এল্, ক্লাসে উপস্থিতি দেখাইয়া পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেন। তা মন্দ কি? শুনিতাম, এই বি, এল্, ক্লাস হইতে স্বত্বাধিকারীর কলেজের সমস্ত খরচা চলিয়া যাইত। বি, এল, ক্লাসের অধ্যাপকদিগের মাহিনা বড় দিতে হইত না। বি, এ, এম্, এ, ক্লাসের অধ্যাপকদিগের, নবপরীক্ষোত্তীর্ণ উকিল, ব্যারিষ্টার, আত্মীয়দের দ্বারাই এ কাজ করাইয়া লওয়া হইত। তাঁহাদের বলা হইত, ইহাতে আদালতের পসার বৃদ্ধি পাইবে ও তাঁহাদেরও আদালতে অত্যধিক পসার না থাকাতে, আনন্দের সহিত সম্মত হইতেন। ক্লাসে পাঠের সময় বিশ জনের অধিক ছাত্র কখনও দেখা যায় নাই। বিবাহ বাটীর ন্যায় এদিক ওদিকে জনতাপুঞ্জ দেখা যাইত; কেহ সিগারেট টানিতেছে, কেহ রসালাপ করিতেছে, কেহ বা সমবেত বন্ধুদের নিকট নবপরিণীতা বধূর প্রেমপত্র পাঠ করিতেছে; "উপস্থিত" উচ্চারণের সময় ক্লাসে সকলে গিয়া বসিত এবং সেই প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা হইলে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিত।

দ্বিতীয় বেগারের কথা—মেসের সূপকার হস্তে নির্য্যাতিত

হইয়া সকলেই রসনা শোধনের জন্য ব্যস্ত থাকিত। বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্বশুরালয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-তর স্থান আছে বলিয়া জানা নাই। সেই জন্য, সকলে সুবিধা পাইলেই শ্বশুরালয়ের দিকে ধাবমান হইত। কিন্তু সে পক্ষে এক বিষম অন্তরায় ছিল। অনেককেই অবস্থার খাতিরে প্রাইভেট টিউসন করিতে হইত। ছাত্রদের অভিভাবকেরা মাষ্টার মহাশয়ের অনুপ-স্থিতি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। রবিবার ভিন্ন অন্য দিন অনুপস্থিত হইলে, তাহাদের অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইত। অনুপস্থিত হইলে অন্ততঃ একজন বদলী দেওয়া চাই; এই জন্য শ্বশুরবাটীগমনাভিলাষী বন্ধুগণ বদলী খুঁজিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। আমার দেশ ও শ্বশুরবাটী কলিকাতা হইতে বহুদূরে হওয়ায় এবং আমি বহুদিন অন্তর বাটী যাওয়ায়, আমাকে প্রায়ই এই বদলীর কাজ করিতে হইত এবং এই বদলীর কাজ হইতেই আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছিল। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। তাহার উপকার করিতে গিয়া আমি যে বিপথে পদার্পণ করিয়া-ছিলাম তাহার জন্য আমি ছাড়া আর কে দায়ী? নৈতিক দুর্ব্বলতা চিত্তের মূলধর্ম্ম হইলে তাহার বাহ্য প্রকটন হইবার পক্ষে কারণের অভাব হয় না। একই ঘটনার ধারা সহস্র ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যায়; কিন্তু চিত্তের প্রতিরোধক্ষমতা না থাকিলে, তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে বেশী বিলম্ব হয় না। আমার বন্ধু বহুদিবস যাবত ঐখানে কার্য্য করিতেছিলেন। তিনিত আমার মত মায়াজালে জড়িত হন নাই। আর মায়াজালই বা কেমন করিয়া বলি? সে ত আমার ক্ষিপ্তকল্পনারই সৃষ্ট—আমার রুগ্ন নৈতিকতার হস্তেই রচিত!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধীরেন নামে এক বন্ধু আমার সহিত মেসে থাকিতেন। তিনি এন্‌ট্রান্স পাশ; কলিকাতায় সামান্য বেতনে চাকরি করিতেন। তাহাতে সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া তাঁহাকে দুই বেলা টিউসন্‌ করিতে হইত। সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তিনি যে ভাবে অনবরত পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইতেন, তাহাতে তাঁহার উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সংসারে স্ত্রী ব্যতীত, মাতা, এক বিধবা পিসি, বিধবা ভগ্নী ও একটী ছোট ভাই ছিল। ভাইটি তাঁহার সহিত মেসে থাকিত ও স্কুলে পড়িত। তিনি যাহা মাহিনা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী ও নিজের অক্লেশে সমস্ত খরচ চলিয়া যাইতে পারিত কিন্তু আত্মীয়-পালন হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অশক্ত হইলেও তিনি তাহাদের ভার বহন করিয়াছিলেন। কখনও তাহাদের নিমিত্ত মনে মনে বিরক্ত হইতেন না। তাঁহার প্রগাঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার সমবয়স্কগণের চক্ষে অনেক সময় প্রবীণতাসূচক বলিয়া বোধ হইত। কখনও কখনও যে তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত না এমন নহে, কিন্তু সে সকল তিনি কর্ত্তব্য পালন পথে আনুসঙ্গিক বিঘ্ন বলিয়া মনে করিতেন। এরূপ ঐকান্তিক ভাবে অথচ নীরবে নিজ কর্ত্তব্যপালন বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং আমার ন্যায় বিপরীত চরিত্র ব্যক্তির নিকট ঐরূপ কর্ত্তব্যপালকও আরাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ধীরেন—ভাবার

ও কার্য্যে—প্রকৃত মিতব্যয়ী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু এরূপ গুণদ্বয়ের সমবর্ত্তিতা অপেক্ষা বিদ্রূপোত্তেজক পদার্থ জগতে আর নাই। ধীরনকে কেহ অসামাজিক, কেহ বা কৃপণ, কেহ বা গর্ব্বিত, কেহ বা নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করিত। এমন কি সময়ে সময়ে অযাচিতভাবে তাঁহাকে এই সকল পদবী প্রদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রায় আমাকে টিউসন-এর বেগার দিতে হইত। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে তৎপর বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল। সেই জন্য আমার নিকট ন্যায্য ও অন্যায্য, নানারকমের অনুরোধ প্রায়ই আসিত। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দুই একজনের অনুরোধ রক্ষা না করিলেও আমার এ সুখ্যাতি একেবারে যায় নাই। একদিন সকালে ধীরেন আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। আমি একখানি পুস্তক পড়িতেছিলাম; আমার ঘরে আরও দুজন থাকিতেন, তাঁহারাও কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন আমি অত লক্ষ্য করি নাই। ধীরেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর আর আসিয়াছিলেন কিনা জানি না। একঘণ্টা পরে আবার আসিলেন, তখনও ঘরে কে একজন ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যে আমার সহিত বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কিন্তু বলিতে অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন। আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে অতি সন্তর্পণের সহিত আমাকে একবার বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। টিউসন্ বেগার দিবার জন্য অনুরোধ করিতে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও লজ্জিত হয় নাই। অধিকন্তু আমার যথেষ্ট অবকাশ আছে জানিয়াই অনেকে সেটা আমার উপর একটা আইনসঙ্গত ন্যায্য দাবী বলিয়া মনে করিত।

কিন্তু ধীরেনের সে দিনের ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল। এইরূপ মনুষ্যত্বের পরিচয়, সামান্য উপকারের প্রতিদানে এরূপ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, নিজার্থে অনুরোধ করিতে এরূপ অকৃত্রিম কুণ্ঠাবোধ, এইরূপ পরানুভূতির প্রতি সাগ্রহ শ্রদ্ধা, আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। ধীরেন এন্‌ট্রান্স পাশ, আর আমি বি, এ, পাশ; তাহার কার্য্য করিতে আমাকে অনুরোধ করা তাহার নিকট কি বিষম বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, তাহা, তাহার কথা অপেক্ষা কথার ভাবে অধিক প্রকাশ পাইতেছিল। অনুরোধরক্ষা হেতু ধীরেনের সে লজ্জাবনতদৃষ্টি, পরস্পরবদ্ধকরযুগল; পতনোন্মুখঅশ্রুপীড়িত চক্ষু, বাষ্পরুদ্ধ অর্দ্ধউচ্চারিত বাক্য, এখনও মনে আছে। তাহা মনুষ্যত্বের প্রকাশ বিশেষের পূর্ণ ছবি—একবার দেখিলেই মনে গাঁথিয়া যায়। ধীরেন আমায় জানাইলেন যে দুই চারিদিন পূর্ব্বে অসম্ভাবিত কারণে তাঁহাকে কামাই করিতে হইয়াছিল। তাহাতে ছাত্রের অভিভাবিকা তাহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, তিরস্কারও করিয়াছেন। গতরাত্রে তিনি বাটী হইতে পত্র পাইয়াছেন যে তাঁহার মাতা কঠিন রোগে আক্রান্ত ও জমিদার বাকি খাজনার দরুণ তাঁহার বাস্তভিটা ক্রোক করিয়াছে। তাঁহার বাটী যাওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এবার কামাই করিলে, তাঁহার টিউসন্ কার্য্য থাকিবে না। পূর্ব্বে তাঁহার বদলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তাঁহার ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অভিভাবিকার মনঃপূত হয় নাই। সমস্ত জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও ছাত্রের অভিভাবিকা তাঁহার নিকট একজন যোগ্য বদলী চাহিয়াছেন। সেই কারণ আমাকে অনুরোধ। তাঁহার কথায় অভিভাবিকার উপর আমার মনে

প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং এরূপ হৃদয়হীন অভিভাবিকাকে দেখিবার জন্য কিঞ্চিৎ উৎসুক হইয়াছিলাম। সে দিন কে জানিত যে সেই অশ্রদ্ধা একদিন কি বিষম বিদ্বেষে পরিণত হইবে! আমি ধীরেনের বদলী কাজ করিতে আনন্দে স্বীকৃত হইলাম। অধিকন্তু বলিলাম, তাঁহার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিবার কোন দরকার নাই; তিনি অনায়াসে সমস্ত প্রয়োজন সমাধা করিয়া সুস্থিরে আসিতে পারেন।

ধীরেন অতি অস্পষ্ট অর্দ্ধস্ফূট ভাষায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার কিছু পর হইতেই আমার মনে এক অচিন্তনীয় ভাবের সঞ্চার হইল। স্বীকৃত হইয়াই মনে হইল যে স্বীকার না করা ভাল ছিল! আমার প্রাণে এক প্রকার জটিল সঙ্কুঞ্চন অনুভব করিতে লাগিলাম—যেন এক কুটিল গহ্বরমধ্যে আমি হাত বাড়াইতেছি কিম্বা কোন অত্যুচ্চ গিরিশিখরের শেষপ্রান্তে হঠাৎ যাইয়া পড়িয়াছি। এক প্রকার ধুম-তরল শঙ্কা আমার অপূর্ণাবয়ব ঔৎসুক্যকে বেষ্টিত করিল। অথচ এরূপ শঙ্কার কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকাতে তৎসঙ্গে আমি নিজে নিজেই আত্মাবমাননা অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপ ঔৎসুক্য, শঙ্কা ও লজ্জার দ্বন্দ্বে ক্ষণেকের তরে আমার মনে একপ্রকার জড়ত্ব অনুভব করিলাম ও অন্তরাত্মার মধ্যে বড় অসুস্থতা বোধ করিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ভাব চলিয়া গেল। আমি এই দুর্ব্বলতার কাছে নিচু হওয়ার নিমিত্ত মনে মনে বড় লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলাম।

সমস্তদিন এক রকম মানসিক চাঞ্চল্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যেই পরণের কাপড় ছাড়িয়া

বাহির হইবার কাপড় পড়িতে গেলাম, অমনি বুকের মধ্যে ভীষণ আঘাত বোধ করিলাম। কে যেন বক্ষের দরজা জোর করিয়া খুলিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি বলিতে চায়! সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। পাছে মতলব বদলাইয়া যায় এবং আমাকে ধীরেনের কাছে অপরাধী হইতে হয়, সেই-হেতু তাড়াতাড়ি বাটীর বাহিরে আসিলাম ও তাহার প্রদত্ত ঠিকানার অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। যেন কোন অদৃশ্য শক্তিতে চালিত হইয়া ক্রমে গন্তব্যপথে আসিলাম। আমার মনে আছে, আমি নির্দ্দিষ্ট বাটী হইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলাম। প্রথমে কাহাকেও ডাকিতে ভরসা হইতেছিল না। দরজা ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল। ২।১ মিনিট দাঁড়াইবার পর, কড়া নাড়িলাম। কেহ উত্তর দিল না; আবার নাড়িলাম, তাহাতেও কোন জবাব পাইলাম না। অল্পক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল যেন ভিতরে কাহার কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছে। এতক্ষণে কাহারও কোন সাড়া না পাইয়া মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম। একবার বোধ হইল, দ্বিতলের জানালায় কে একজন দেখা দিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইল। তৃতীয়বার সজোরে ও অধিকক্ষণ ধরিয়া শব্দ করিলাম। এইবারে দ্বিতল হইতে একজন বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল "কে আপনি"? কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, স্ত্রীলোক! কিন্তু সেই স্বরের তীক্ষ্ণতা যেন আমার কর্ণকুহর ভেদ করিয়া মস্তিষ্কের কোমলতমস্থান বিদ্ধ করিল। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর এইরূপ রুক্ষ হইতে পারে, আমি কখনও জানিতাম না। সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। আমি প্রথমবারে

কোন উত্তর দিতে পারি নাই। আমার উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার শব্দ আসিল, "আপনি কে ?" এইবার উত্তর দিলাম—"মাষ্টার !" অল্পক্ষণ পরেই দরজা খুলিয়া দিয়া, একটি সুন্দরী যুবতী বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইল। একজন লোক ও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া ক্ষিপ্রপদক্ষেপে চলিয়া গেল। তাহার আচরণে বোধ হইল সে যেন নিজের পরিচয় গোপন করিতে ব্যস্ত। আমি ভিতরে যাইবার পথে গিয়া দাঁড়াইলাম। কাহাকেও না দেখিয়া অপ্রস্তুত হইলাম। এমন সময় লজ্জানিম্ন অথচ স্পষ্টভাষায় কাহাকে বলিতে শুনিলাম "মাষ্টার বাবুকে দাঁড়াতে বল।" একটি চারি বৎসরের শিশু আসিয়া সেই খবর দিল। এইরূপে দশ মিনিট কাল অতীত হইলে, একটী এগার—বার বৎসরের বালক আসিল এবং বাহিরের ঘরের দরজার চাবি খুলিল।

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখনও আমার সঙ্কোচের ভাব পুরামাত্রায় যায় নাই। আবার সেই সঙ্কোচ আমার নূতন ছাত্রের স্থৈর্য্যের সান্নিধ্যে অধিকমাত্রায় বর্দ্ধিত হইল। এগার—বার বৎসর বয়স হইলেও, কথাবার্ত্তা চাল-চলন, বয়স অপেক্ষা অনেক পক্ব, তাহাতে সারল্য, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি বাল-সুলভ দোষগুণ সকল অতি অল্প পরিমাণেই বর্ত্তমান ছিল। যে কারণেই হউক, আমার তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন অবস্থা বৈষম্য তাহার অন্তর হইতে বাল্য-ভাব অকালে জোর করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। পাঠে তাহাকে বেশী চতুর বলিয়া মনে হইল না। সাংসারিক ব্যাপারে, তাহার জ্ঞান অপেক্ষা চতুরতা, অধিক পরিমাণে লক্ষ্য হইল। আমাকে তাহার প্রশ্নচয় অবমাননাসূচক না হইলেও, তাহাদের গঠন অযথা ঘনিষ্ঠতা-

জ্ঞাপক ছিল। মোটের উপর বালকটী একটী আদর্শ 'অকাল-পক্ক' ছেলে। শ্রদ্ধা কিম্বা ভক্তি ব্যাপারে তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। প্রথম দুই এক দিনের পরেই, আমার সহিত খুব পরিচিতের ন্যায় নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে আমার বাটীর কথা, মেসের কথা, ল-কলেজের কথা, জানিতে উৎসুক। আমার মনে আছে, মেসের কথা উপলক্ষে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মেসে থাকিলে নাকি রাত্রে সিদ্ধি খাইতে হয়? মেসের ঠাকুররা নাকি রাত্রে গরুর গাড়ী হাঁকে? ঝিরা না কি বাবুদের গান শুনায়' ইত্যাদি।" আমার ছাত্রের কথায়, কলিকাতাবাসীর মেসের বাবুদের উপর কিরূপ অভিমত ও কলিকাতার বালকের সাধারণ বিষয়ে কিরূপ অভিজ্ঞতা—উভয়েরই কিছু কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

এখন প্রথম দিনের কথা।—পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই, আমার ছাত্রের একবার এক অতি মার্জ্জিত কোমল কণ্ঠে ডাক পড়িল "সতীশ, একবার শোন"। সতীশ বলিল "কেন দিদি"; দিদি বলিল "শোন না একবার, বড় দরকারী কথা।" সতীশ চলিয়া গেল ও আসিয়াই বলিল "আপনি আজ যাইতে পারেন।" কথাটা আমার কিরূপ লাগিল! আমার মনে হইল, আমার উপস্থিতি যেন তাহাদের কোন কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিতেছে; আবার পরক্ষণেই ভাবিলাম রাত্রি হইয়াছে বলিয়া এরূপ বলিল। আমি চলিয়া আসিলাম; আসিবার সময় দেখি যে ব্যক্তিকে ছাত্রের বাটী হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, যেন সেই ব্যক্তিই গলির মুখে কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া, আমার মনের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে; কারণ মনে পড়ে, আমার মেসের একজন হাস্যরসিক বন্ধু আমি অন্যমনস্ক ভাবে কি বলিতে

যাইয়া কি কথা বলাতে আমার সিদ্ধির নেশার প্রাবল্য ও মস্তকে জল সেচনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিল।

আরও দুই একবার আমার এই বাটীস্থ ব্যক্তিগণের ব্যবহার কিঞ্চিৎ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহাতে আমার প্রথম দিনের কথা প্রায়ই মনে পড়িত। সতীশের অভিভাবকই বা কে? যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল ওই বা কে? দ্বার খুলিয়া দিতে অত দেরী করিল কেন? আমার বাটীত্যাগের জন্য তাহারা অত ব্যস্ত হইয়াছিল কেন? ঐ ব্যক্তি গলির মোড়ে কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল?—এই সব প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনে আসিত। আমি জোর করিয়া সে সকলকে মনোমধ্যে চাপিয়া ফেলিতাম। কতকগুলি ভদ্রবন্ধুদের সংস্পর্শে আসিয়া আমি সামাজিক ব্যবহারে ইচ্ছাকৃত নির্ব্বোধিতা দৃষ্টিহীনতা ও তাহার পারিপার্শ্বিক, ব্যবহারিক নিয়ম—সন্দেহস্থানে উত্তমাংশ গ্রহণ করা—কতক (যদিও অত্যল্প) পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলাম; মন্দ অর্থ না লইয়া ভাল অর্থ গ্রহণ করা, খারাপ দিক স্পষ্ট দেখা যাইলেও চেষ্টা করিয়া উত্তম দিক দেখিবার চেষ্টা করা, অনেক বিষয় বুঝিয়াও না বুঝা ও ভাল বলা, মন্দকে উত্তমরঙ্গে দেখান ও নিজে জোর করিয়া দেখা প্রভৃতি মার্জ্জনীয় অসত্যতা ভদ্র সমাজে ব্যবহারপক্ষে প্রয়োজনীয় ও বহুস্থলে অনর্থক অশান্তি-নিবারক, অধিকন্তু অনেকস্থলে শান্তিদায়ক বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম।

সে দিন রাত্রে নিদ্রা গেলাম; আন্দাজ রাত্রি একটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গরম বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পাইচারি করিলাম; রাত্রি অনেক আছে দেখিয়া পুনরায় নিদ্রা গেলাম।

ভোরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। যেন আমি এক নূতন রাজ্যে বেড়াইতে গিয়াছি। সঙ্গে কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আছেন। তিনি কে, কোথা হইতে আমার সঙ্গে আসিলেন—তাহা আমি জানি না; তথাপি তাঁহার যেন আমার উপর প্রভুত অধিকার ও ক্ষমতা আছে। তাঁহার ইচ্ছায় যেন এখানে আসিয়াছি, চলিতেছি ও ফিরিতেছি। তিনি আমার সঙ্গে থাকিয়া নির্ব্বাক ভাবে—ইঙ্গিতে—আমাকে সব দেখাইতেছেন। কাল প্রভাত; আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ; বাতাস ঈষৎ প্রবল বেগে বহিতেছে; প্রাতঃসূর্য্য-কিরণ কৃষ্ণমেঘের সূক্ষ্ম আবরণ মধ্য হইতে বাহির হইয়া পূর্ণচন্দ্ররশ্মির আকার ধারণ করিয়াছে ও ধরাকে এক অপার্থিব মোহে আবৃত করিয়াছে। পৃথিবীর প্রতিদিনের পরিচিত অতি সাধারণ বস্তুও যেন এক নব নৈসর্গিক বায়ুসূক্ষ্মআচ্ছাদনে আবৃত হইয়া নূতন ও অপরিচিত দেখাইতেছে। জলে, স্থলে, বৃক্ষে, পল্লবে, পশু, পক্ষীতে, কি যেন অনির্ব্বচনীয় মোহিনীশক্তি আসিয়াছে। আমি তন্ময় হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছি। ক্রমে প্রাণে এক অপূর্ব্বানুভূত, অদম্য, শোষণকারী আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইল। আমি কি করিতে ইচ্ছা করি, কি চাই, কিসে আমার তৃপ্তি হইবে, কিসে আকাঙ্ক্ষার শান্তি হইবে, তাহা নিজেই জানি না। ক্রমে অন্তরের পিপাসা বৃদ্ধি হইল ও আমাকে তাহার প্রাবল্যে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল। আমার অপরিচিত সঙ্গী এতক্ষণে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, সে আমাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া একদিকে দেখাইল। সেই দিকে চাহিয়া দেখি, এক অপরূপ বিহঙ্গম পুষ্করিণীর প্রান্তে, শ্যামল তরুপল্লবে বসিয়া রহিয়াছে।

এরূপ মনোহর পক্ষী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এরূপ বিচিত্র বর্ণ, এরূপ বিচিত্র গঠন, এরূপ পক্ষচয়, এরূপ স্নিগ্ধাভ নয়নদ্বয় পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দেখিয়াই মনে হইল, ইহাকে পাইলেই যেন আমার অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে। আমি তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলাম। পাছে তাড়াতাড়ি করিলে পক্ষী উড়িয়া যায়, এই জন্য অতি কষ্টে, প্রাণের বেগ চাপিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু কিছুদূরে যাইয়া দেখিলাম, তাহার পলাইবার কোন প্রবৃত্তি নাই; অধিকন্তু গ্রীবা সঞ্চালনের প্রকার হইতে মনে হইল আমারই কাছে আসিতে ইচ্ছুক। তাহাকে ধরিলাম। তাহার স্পর্শে ক্ষণিকেই যেন আমার অর্দ্ধেক জ্বালার শান্তি হইল। তারপর তাহাকে আমার বক্ষোপরে স্থাপন করিয়া, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার মানসে আমার সহচরের দিকে অগ্রসর হইলাম। যাইতে যাইতে বক্ষে ভার বোধ হইল। চাহিয়া দেখি যে, পক্ষীর ক্ষুদ্র আকার আয়তনে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। পদদ্বয় কি বিশ্রী, বিকট আকার ধারণ করিয়াছে; যেন এক একটী অর্দ্ধশুষ্ক, সজীব, লম্বায়মান সর্প; চঞ্চু শেলবৎ কঠিন ও খড়্গবৎ শাণিত; বপু যেন এক অতি মহাকায় ক্রুদ্ধ সাজারুর ন্যায়। আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম ও তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে তাহার পদদ্বয় দ্বারা সজোরে আমাকে জড়াইয়া ধরিল; বোধ হইল যেন আমার বক্ষের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আমি ছাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা করায়, সে চঞ্চুর দ্বারা চক্ষুতে প্রহার করিতে ও একপ্রকার ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। সে শব্দ যেন পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছি। মনে পড়িল, পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় ছাত্রের বাটীতে দরজা খুলিবার পূর্ব্বে যে কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক এ তা'রই অনুরূপ। আমি সঙ্গীর

দিকে চাহিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলাম, কিন্তু সে বিকট হাস্যে আমার প্রার্থনা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিল। সেই জীবের হস্ত হইতে আপনাকে ছাড়াইবার বিফল চেষ্টায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। চেঁচাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চেঁচাইতে পারিলাম না। এমন সময় দেখিলাম, আমার স্ত্রী দূরে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিতেছে; যেমন নিকটবর্ত্তী হইবে, অমনি সেই পুরুষের স্পর্শে গতপ্রাণা হইয়া ভূমিতে পতিতা হইল; পুরুষও অদৃশ্য হইল।

ঘোর শঙ্কায় আমার প্রাণ ফাটিয়া অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার বাহির হইল। ঘামে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। দ্রুত নিশ্বাস পড়িতেছিল! হৃৎপিণ্ড যেন স্থানচ্যুত হইতেছিল। নড়িবার শক্তি ছিল না। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্তও আমার প্রকৃত অবস্থা স্থির করিতে পারিলাম না। এ ঘটনা সত্য কি স্বপ্ন, স্থির করিতে আমার কিছুক্ষণ সময় লাগিয়াছিল। ক্রমে সূর্য্যালোক দেখিয়া ও জানালার বাহিরে লোকজনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। পূর্ব্বে, সন্ধ্যার ঘটনার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে একথা আমার মনে উদয় হইতে দিলাম না। Nightmareএর কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম; ইহা তাহা ছাড়া কিছুই নহে স্থির করিয়া শান্ত হইলাম।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সতীশকে পড়াইতে যাইতে লাগিলাম। ৮।১০ দিনের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। তাহার পর ২।৪টী সামান্য বিষয় আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল। কিন্তু ঐ সমস্ত সে সময় অতি সামান্য ঘটনা মনে করিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এখন সে সকল আমার কাছে অতীব গূঢ়-কৌশল-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। যতদূর মনে আছে, দিন দশেক যাইবার পর সতীশের পড়িবার টেবিলের উপর একখানা গানের খাতা দেখিয়াছিলাম। গানগুলি সমস্তই প্রেম- বিষয়ক; নানা কবিগণের গ্রন্থ হইতে চয়িত; হস্তলিপি দেখিয়া বুঝিলাম—স্ত্রীলোকের; নির্ব্বাচন প্রণালী হইতে বুঝিলাম—যুবতীর। নির্ব্বাচন-নৈপুণ্য বিশেষ কিছু দেখা গেল না। ২।৩টী ব্যতীত, সুরুচিবিরুদ্ধ গান বড় একটা ছিল না। গানের বইয়ের যে পাতা খোলা ছিল, তাহার একটীর ধারে সদ্য-লিখিত অক্ষরে লেখা ছিল, "আমি এই গানটি বড় ভালবাসি।" লেখা দেখিয়া সে গানটী পড়িতে ইচ্ছা হইল। দেখিলাম, সে একটী সাধারণ গান,—কোন প্রণয়পিপাসাকুলা, অতৃপ্তিপ্রপীড়িতা প্রেমিকা, কোন অজানা প্রেমিকের উদ্দেশ্যে গান গাহিতেছে—যেন কোন অন্ধ শক্তির রহস্যময় প্রভাবে তাহাদের হঠাৎ একবার দৃষ্টির আদানপ্রদান হইয়া আবার যেন সেই শক্তির প্রকোপে তাহারা কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আবার কবে সাক্ষাৎ হইবে, তাহার কোন

নিশ্চয়তা নাই। অথচ পুনর্মিলন একেবারে অসম্ভব বলিয়া মন মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক। প্রেমিক, কাছে থাকিয়াও যেন বহুদূরে, প্রেমিকার মনের ভাব বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না; প্রেমিককে ধরিতে গেলে অদৃশ্য হয়, ইত্যাদি।

আর একদিনের কথা—আমি ছাত্রের বাটীতে যাইয়া দেখি, সম্মুখের দরজা খোলা রহিয়াছে। আমি পড়িবার ঘরে যাইয়া দেখি, সেখানে সতীশ নাই। এক সুন্দরী যোড়শী তথায় বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল! আমিও অত্যধিক অপ্রস্তুত হইলাম। জড়িতস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সতীশ বাড়ীতে আছে?" লজ্জা-প্রপীড়িতা উত্তর আসিল—"হাঁ, আপনি বসুন" এই বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর গেল। আমি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর চাহিয়া দেখি একখণ্ড পত্রের উপর শুধু লেখা আছে 'একজন বড় নিষ্ঠুর না হইলে—'ইহার অর্থ কি? কাহার দ্বারা লিখিত? আমি অত বুঝিতে পারিলাম না; শুধু দেখিলাম, ইহার এবং গানের বইয়ের লেখিকা এক, সতীশের কথায় বুঝিলাম, লেখিকা তাহারই অবিবাহিতা ভগ্নী।

তৃতীয় দিনের কথা—পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এত দিনের মধ্যে আমার সতীশের মাতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে সতীশের কাছে শুনিয়াছিলাম যে তিনি মেয়ে ডাক্তার; প্রায়ই বাড়ীতে থাকেন না; 'কলে' যাইতে হয়। সতীশ বলিয়াছিল, যে তাহার মা, আমার অধ্যাপনা-প্রণালী, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানহেতু, আমার বিশেষ প্রশংসা করেন। কাজেকাজেই অপরিচিতা প্রশংসাকারিণীর উপর আমার অন্তর, পূর্ব্ব হইতেই অনুকূলভাবাপন্ন হইয়াছিল। সেদিন হঠাৎ সতীশকে কে

ডাকিয়া লইয়া গেল। ১০।১৫ মিনিট পরে সতীশ ফিরিয়া আসিয়া বলিল "মা একবার আপনাকে উপরে ডাকিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া ঔৎসুক্যের আকুলতায় আমার হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুত-স্পন্দিত হইতে লাগিল। সতীশের সঙ্গে উপরে যাইয়া দেখি এক অল্পায়তন ঘরের দরজার সম্মুখে এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে; বয়স আন্দাজ ৪০।৪২ হইবে; শরীর অতি ক্ষীণ ও অস্থিসঙ্কুল; কপাল উচ্চ এবং আয়ত চক্ষু বড় বড় ও বহির্মুখী, মুখমণ্ডল গোলাকারও নয় দীর্ঘাকারও নয়, বরং দুয়ের সংমিশ্রণে কতকটা বাঙ্গালা সংখ্যায় পাঁচের মত। মোটের উপর লিটনের Last Days of Pompeiএর ডাইনির যে বর্ণনা পড়িয়াছিলাম, ইহার আকৃতি তাহারই অনুরূপা। তাহাকে দেখিয়া ধরিয়া লইলাম, প্রথম দিন যে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, তাহা ইহারই হইবে। যদিও তাহার আকৃতি ভক্তিউৎপাদক নহে, তথাপি সেদিন সে বাটী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার ব্যবহারে আমার তাহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আসিয়াছিল ও অপর্য্যাপ্ত হেতু হইতে অভিমতগঠনের জন্য নিজের উপর আত্মগ্লানি আসিয়াছিল। তাহার সেদিনকার স্নেহ-সূচক কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে আমার মন দ্রবীভূত হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই বলিল "বাবা, আপনাকে বিশেষ দরকারে ডাকিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না।" পরে বসিতে বলিয়া আমাকে তাহার প্রয়োজন বিষয় জানাইল—বলিল সেই রাত্রিতে এক বিশেষ কারণে তাঁহাকে মফস্বলে যাইতে হইবে; ৪।৫ দিন আসিতে পারিবে না; বাড়ীতে কেহ অভিভাবক থাকিবে না; কেবল মনোরমা, সতীশ ও ছোটছেলে এবং ঝি রহিল; সে জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে তাহাদের দেখা

শুনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে আমাকে উপরে ডাকান হইয়াছে। অবশ্য আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলাম। আন্দাজ ২০ বিশ মিনিট কাল সেই ঘরে ছিলাম, ইহার মধ্যে তিন চারিবার মনোরমার ডাক পড়িয়াছিল। কি কারণে তত মনে নাই—শুধু পান দিবার পাত্রের অভাব হইয়াছিল, কিম্বা স্মেলিং-সল্টের ( smelling salt ) শিশির দরকার হইয়াছিল—ঠিক বলিতে পারি না। আমি আজ প্রথম মনোরমাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম মাতা ও কন্যার আকৃতিতে কোন সাদৃশ্য নাই; কন্যা আদর্শ-সুন্দরী না হইলেও সে যে অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, সৌষ্ঠব-শালিনী ও পরিপুষ্ট যৌবনা এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই নূতন কার্য্যের ভার লইয়া আমি কতকটা উদ্বিগ্ন হইলাম। আবার ইহা অত্যন্ত বিশ্বাস-সূচক ভাবিয়া মনে মনে গৌরব অনুভব করিলাম। একমাসের পরিচয়ের মধ্যে এক প্রাপ্তবয়স্কা যুবতীকে এক যুবকের হস্তে রাখিয়া যাওয়া কম বিশ্বাসের কাজ নয়! তখন যদি সেই অত্যধিক বিশ্বাসের অর্থ বুঝিতাম, তাহা হইলে হয়ত আমার এইরূপ চরম দুর্দ্দশা হইত না! আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে বারান্দার কতক অংশ দেখা যাইতেছিল। একবার লোকের কথাবার্ত্তা হঠাৎ কানে গেল, চাহিয়া দেখিলাম মনোরমা দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছে। সে পুরুষ কি স্ত্রীলোক, তাহা দেখিতে পাইলাম না এবং অতি ক্ষীণস্বরে কথাবার্ত্তা হইতেছিল বলিয়া কণ্ঠস্বর বুঝা গেল না। হঠাৎ রাগত ভাবে একজনকে বলিতে শুনিলাম "আচ্ছা—আচ্ছা—ঢের দেখেছি"। তাড়াতাড়ি সতীশের মা উঠিয়া গেল। কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিলাম এক ব্যক্তিকে

সেস্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে, কিন্তু সে ব্যক্তি যাইতে অনিচ্ছুক। বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে রাজী করা হইল এবং বাহিরের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া হইল। সতীশকে তাহার মা দরজা বন্ধ করিয়া উপরে আসিতে বলিলেন। আমার ব্যাপারটা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। মোটের উপর সে বাড়ী ত্যাগ করিবার কালীন আমি মনে মনে বেশ পরিতুষ্ট হইয়াই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন হইতে বৈকালে যাওয়া ব্যতীত আরও দুই একবার যাইতাম ও কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতাম। মনোরমা কখনও আমার সম্মুখে আসিত না। সতীশকে ও ঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইত। আমি তখন দেখিতাম ও বাড়ীতে বেশীবার যাওয়া মনোরমার ইচ্ছা নয়। কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, সে যেন আমার আগমন ও প্রশ্নকরণ ততটা ভালবাসে না। তাহা আমি তাহার লজ্জাশীলতার জন্য বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। তিন চার দিন গত হইল, কিন্তু মা ফিরিলেন না কিম্বা কোন খবর পাঠাইলেন না; কিন্তু তাহাতে তাহাদের বাটীর কাহারও উদ্বিগ্নের কোন লক্ষণ দেখিলাম না। আমি নিজেই একদিন সতীশের নিকট তাহার মাতার কথা উত্থাপন করাতে এবং সম্প্রতি তিনি কোথায় এবং কি কার্য্যে গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করাতে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিল ও সে বিষয় ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয় উত্থাপন করিতে ব্যস্ততা প্রকাশ করিল। তাহাতে ঔৎসুক্য প্রবলতর হওয়ায় আমি নানারূপ প্রশ্ন দ্বারা তাহার নিকট হইতে সংবাদ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে সেও অনুরূপ দক্ষতার সহিত আমার বাসনা

প্রতিহত করিতে লাগিল। বালকের চাতুর্য্য দেখিয়া মনে হইল যে গুপ্তবিষয় লুক্কায়িত করা তাহার পূর্ব্ব হইতেই অভ্যাসগত হইয়াছে ও সে গোপনীয় বিষয়ের গুরুত্ব কিছু না কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছে। অবশ্য সে সময় আমার ঔৎসুক্য সন্দেহে পরিণত হয় নাই, কারণ আমি জানিতাম যে এইরূপ অনেক ব্যাপার যাহা পল্লীগ্রামবাসীর নিকট রহস্যময় ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় সে সমস্ত বিষয় নগরবাসীর দৈনিক সংসারযাত্রা ও নৈতিক জ্ঞান হইতে গঠিত এবং আদৌ সন্দেহসূচক নহে।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুই সপ্তাহ গত হইল, কিন্তু তথাপি মা ফিরিলেন না। ইহার মধ্যে মনোরমার নামে একখানি পত্র আসিয়াছিল; সে পত্র আমারই হস্তে পিয়ন দিয়া যায়। তখন সতীশ সেখানে ছিল না, দেখিলাম চিঠির উপর 'রাঁচির' ছাপ রহিয়াছে। একবার চিঠিখানি খুলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহা অতি ভদ্রতা বিগর্হিত কার্য্য ভাবিয়া মনকে নিরস্ত করিলাম। সতীশকে ডাকিয়া পত্র উপরে পাঠাইয়া দিলাম। তাহা পড়িয়া সতীশের ও মনোরমার মনে কি ভাব হইল বলিতে পারি না, কিন্তু নূতনত্বের মধ্যে দেখিলাম সতীশ সে দিন আর পড়িতে আসিল না। কিছুক্ষণ পরে তাহার ভাই আসিয়া সংবাদ দিল "দাদাবাবু, আজ পড়া হ'বে না, দিদিমণির অসুখ করেছে।" আমি উদ্বিগ্নতার সহিত কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে কিছু বলিতে পারিল না। অগত্যা চলিয়া আসিলাম, মনে হইল, লিখিত সংবাদের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পরদিন প্রত্যূষে তাহাদের বাটীতে যাইলাম, সতীশের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাহার ভগ্নির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে; অসুখ হঠাৎ মাথা ধরা ছাড়া কিছুই নহে। এই দিন হইতে আমি মনোরমার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। যদিও সে আমার সম্মুখে আসিত না বা কথা কহিত না, তথাপি দেখিতাম যে সে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে দেখিয়া দূরে পলায় না কিম্বা আমার আগমন অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করে না। অন্তরালে তাহাকে

শ্রবণযোগ্য উচ্চকণ্ঠে ঝির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিতাম ও মাঝে মাঝে সতীশের মারফত দুই একটি সামান্য অনুরোধও পাইতাম।

এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল, বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয় নাই। তাহার পর একদিন যে ঘটনা ঘটিল, তাহা হইতে আমার মস্তিষ্কের যে বিকৃতি জন্মিয়াছিল, তাহা কিছুতেই লোপ পায় নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমার সর্ব্বতোমুখী ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি যথারীতি সন্ধ্যার সময় সতীশকে পড়াইতে গিয়াছি; সতীশ বাড়ীতে নাই, কি কার্য্য উপলক্ষ্যে নিকটে কোথায় গিয়াছে। চৈত্র মাস,—দক্ষিণ দিকের জানালা হইতে বাতাস আসিয়া গায়ে বেশ লাগিতেছিল। জানালা দিয়া সুনীল আকাশপটে অর্দ্ধাঙ্কিত চন্দ্র এবং পাড়ার দিকে চাহিয়া আছি। উপরে মনোরমা ও নীচে আমি, বাকী বাড়ীতে আর কেহ ছিল না। সহসা সুললিত রমণীকণ্ঠে গান উঠিল। যতটুকু মনে আছে গানটি এইরূপ হইবে—

আমি দেখাব না কা'রে, কি পেয়েছি আজ
কি চারু রতনরাজে!
আমি বলিব না কা'রে, কে এসেছে আজ
এ দীন কুটীর মাঝে!
হৃদয়ে উঠেছে ঝটিকা যে আজ,
ভুলিয়া গিয়াছি রোজকার কাজ,
কোথায় যাইল রমণীর লাজ,
হৃদয়ে কি সুর বাজে,

আমি কি করে দেখাই, যদি বা হারাই
আমার রতনরাজে !

গীত আমি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম ; আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যাকারিতাশক্তি যেন কর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আমার কাছে সমস্ত পৃথিবী যেন সেই গানের শব্দতরঙ্গে লঘু মেঘের ন্যায় ভাসিতেছিল। কতক্ষণ শুনিয়াছিলাম,—কখন বা গান থামিয়া গিয়াছিল, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে আমি বিকৃতমস্তিষ্কের ন্যায় শূন্যদৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়াছিলাম। সতীশ যখন সম্মুখ দিয়া ভিতরে যায় তখন তাহাকে লক্ষ্য করি নাই, পরে দুইবার ডাক দিবার পর আমার নাকি চৈতন্য হইয়াছিল। ভাবিলাম মনোরমা গীত আমারই উদ্দেশ্যে গাহিয়াছে। অবশ্য এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণ ছিল না। ওরূপ ভাবিতে আমি আমার মধ্যে অত্যধিক অস্মিতা-গুণের দ্বারাই প্ররোচিত হইয়াছিলাম। এই অযথা অস্মিতাগুণের বিকারই আমাকে অনেক সময় বিপথে চালিত করিয়াছে, তাহা আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয় আপনাতে আরোপ করা ও সেইরূপ ভাবিয়া আপনাকে কার্য্যক্ষেত্রে চালিত করার অপেক্ষা গুরুতর মানসিক ব্যাধি সংসারানভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে আর আছে কি না সন্দেহ। এই গুরুতর মানসিক দুর্ব্বলতার মূলে আমার অদৃষ্টের পনের আনা অনর্থের অঙ্কুর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

সে দিন আমি মেসে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনুষ্য। সেই সুললিত কণ্ঠের গান আমার হৃদয়ের মধ্যে শতবার প্রতিধ্বনিত হইয়া কোন দূরদেশে মিলাইয়া যাইতেছিল!

সাক্ষাৎ শ্রবণ অপেক্ষা তাহার পশ্চাদ্গামী স্মৃতি যে এত মনোরম, তাহা আমি আগে কখনও বুঝি নাই। কি মোহময় ঝঙ্কারে মন পূর্ণ হইল তাহা বলিতে পারি না। শতবার সেই পংক্তিটি মনে পড়িল "আমি দেখাব না কা'রে, কি পেয়েছি আজ"; আমার মন হইতে কোথায় চলিয়া যায়, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া নবশব্দবিন্যাসে মনে আসিয়া উদিত হয়। আমি যেন একটা প্রকাণ্ড মুহুঃ-বর্দ্ধিতায়ন ধ্বনি-সরোবরে নিমজ্জিত হইলাম। কোথাও কূল নাই—কেবল সেই বিচিত্র শব্দরাশি। গায়িকা যে হৃদয়ের অসহ্য আবেগভরে গান গাহিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। স্বরভঙ্গিমা যে প্রাণের গুহ্যতম বেদনা ব্যক্ত করিতেছিল, তদ্বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম। এ যে শুদ্ধ অলসভরে অভ্যাসগত গান গাওয়া, তাহা আমি একেবারেই মনে করিতে পারিলাম না; আমার কাছে তাহা প্রণয়িনীর স্বতঃস্ফুরিত নৈসর্গিক ভাষা বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। আমি যে এতদিন সমস্ত বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম। আমার অন্তরের ভাব গোপনের জন্য তাহার মনে কি দুরূহ বেদনা হইয়াছিল, তাহা আমি ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এরূপ মানসিক অসুস্থতা আমাকে কিছু দিনের জন্য বিশেষরূপে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার দুই তিন দিনের মধ্যেই মা ফিরিয়া আসিলেন। এখন তাঁহার কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য হইয়া থাকিবে। এখন দেখিতাম যে ছেলে মেয়েদের জন্য নূতন কাপড় জামা আসিল ও প্রায় প্রতিদিনই বাটীতে নূতন নূতন মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। আমাকে সেই সব জলখাবার পাঠান হইত। ইদানিং

আমি একরকম ঘরের ছেলে হইয়া গিয়াছিলাম। দিন দিন ইহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। আমার বৈকালে টিউসনের সময় থাকিলেও দিনের মধ্যে দুই তিন বারের কম যাইতাম না। রাত্রিতে প্রায় মেসে থাকিতাম না। আমার আইনের পুস্তক সকল তাহাদের পাঠকের ন্যায় সতীশের পড়িবার ঘরে এক যায়গায় স্থান পাইল। মেসের অনেকেই জানিত যে আমাকে তথায় পাওয়া না যাইলে ছাত্রের বাড়ীতে পাওয়া যাইবে। সেই জন্য আমার অনুপস্থিতিতে কেহ দেখা করিতে আসিলে তাহারা তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিত। নূতন পরিবর্ত্তনের ব্যস্ততার মধ্যে পড়িয়া আমি বাড়ীর কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার মনে আছে অনেক দিন বাটীর চিঠি পত্রের কোন উত্তর না দেওয়ায় টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। তাহাতে আমার লজ্জা হওয়া দূরে থাকুক আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল এইরূপ অসহিষ্ণু উদ্বিগ্নতার কোন কারণ নাই। যে পুত্রের খবর না পাইলে, আমি স্থির থাকিতে পারিতাম না, তাহারও কথা মনে আসিত না। আমি যেন অপর এক সংসার পাতিয়াছি। আমার স্ত্রীপুত্র যেন দূর দরিদ্র-আত্মীয়দের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বহুদিন পরে বাটী আসিয়াছি। এবার পূর্ব্বের ন্যায় গভীর ঔৎসুক্য লইয়া আসি নাই; যেন না আসিলে খারাপ দেখায় সেই জন্য আসিয়াছি এবং মনে মনে যেন একটা অত্যাচারিতের ভাব পোষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। কালকাতায় থাকিতে শেষ দিকে স্ত্রীর নিকট হইতে যে সমস্ত পত্র পাইতাম, তাহাতে যেন পূর্ব্বের অকৃত্রিমতার ভাব লক্ষিত হইত না। নিজে অপরাধ করায় আমার সর্ব্বদা মনে হইত, যে আমার কলিকাতার সমস্ত সংবাদ স্ত্রীর নিকট পৌঁছাইত, আর সে সমস্ত বিশ্বাস করিয়া মনে মনে আমার উপর ঘৃণার ভাব পোষণ করিত। আর সেরূপ করা তার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় বিবেচনায় তাহার উপর অসন্তুষ্টও হইয়াছিলাম। পাপ সর্ব্বদাই পরদোষদর্শী। নিজে দোষ করিয়া তাহা অতি তুচ্ছ মনে করা এবং সেই দোষকে কেহ দোষ বলিয়া গণ্য করিলে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ মনে করা পাপের একটি প্রধান রীতি। আমি কোন দোষ করি নাই কিম্বা করিলেও তাহা সামান্য হইতে সামান্যতর এবং আমার স্ত্রী সে সকলকে গুরুতরভাবে গ্রহণ করিয়া অত্যধিক সংকীর্ণহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছে এইরূপ ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া আমি এবার বাড়ী গিয়াছিলাম। যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মনের পূর্ব্বভাব আরও বিষময় হইয়া উঠিল। বাহির হইতে মনে হইল যেন বাটী এক নিরানন্দময় নিস্তব্ধতায় আবৃত, আর তাহার মধ্য দিয়া যেন অশান্তির বাষ্প

ধূমান্বিত হইয়া কষ্টে বাহির হইতেছে। বাতাস যেন বাটীর নিকট দিয়া যাইবার সময় ঔৎসুক্য-রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে; বৃক্ষশ্রেণী একটা আসন্ন ভীষণ দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বিস্ফারিত নয়নে অবিচল দেহে দাঁড়াইয়া আছে; পশু পক্ষীদের ক্ষীণরব শোকাকুলিত বলিয়া মনে হইতেছে; রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—পৃথিবীতে যেন ঘোর অশান্তির আগুণ জ্বলিয়াছে। বেলা ১১টা আন্দাজ আমি বাটীতে পৌছিলাম। বাড়ী প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। যদিও পূর্ব্বে পত্র দিয়াছিলাম, তথাপি কেহ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল না। তাহাতে আমি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলাম। ইহাতে কাহারও অপরাধ ছিল না, কারণ পূর্ব্বে অনেক সময় নিশ্চিতাগমনের সংবাদ দিয়া কার্য্যে তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলাম; সেই জন্য এবার যে কথামত কার্য্য করিব এরূপ বিবেচনা করিলে তাহা তাহার বুদ্ধির একান্ত অল্পতার পরিচায়ক হইত। আমার পুত্র বাটীতে ছিল না, কোন প্রতিবেশীর বাটীতে গিয়াছিল। আমার স্ত্রী রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত ছিল; আমি যাইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম, তখনও খবর পায় নাই যে আমি বাটী আসিয়াছি; কাজেই আমাকে সম্ভাষণ করিতে আসে নাই। আমি কিন্তু তাহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া মনে করিলাম। কি ভয়ানক তাচ্ছিল্য! কি স্পর্দ্ধা! কি হৃদয়হীনতা! এতদিন পরে বাটী আসিলাম, আমার সহিত হাস্যালাপ করা দূরে থাকুক কাছে আসিতেও অনিচ্ছা! কি এমন অপরাধ হইয়াছে? এক অভিভাবকহীনা শিক্ষিতা বালিকার দায়িত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধানের জন্য যদি বা ছ'মাস বাটীতে না আসিতে পারি, তাতেই বা কি হইয়াছে? বিবাহ করা কি একটা অজ্ঞ অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের নিকট

চিরদাসত্বে বদ্ধ হইবার জন্য? আমার একবার বাটী হইতে চলিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল মন এরূপ চিন্তায় আলোড়িত হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একজন বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার তীব্র রসিকতার উৎস উছলিয়া উঠিল; তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করুণা! আর বাটীর সঙ্গে দেখাশুনা নেই, কলকেতায় কি নূতন বৌমা কেড়েছিস্ নাকি?" আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম "না সময় পাই নি।" আমাদের কথাবার্ত্তা আমার স্ত্রীর কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে; সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল যে আমি আসিয়াছি, অমনি অবগুণ্ঠন টানিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর নিজ কার্য্য সারিয়া উক্ত প্রতিবেশিনী চলিয়া গেলেন। তখন সরলা (আমার স্ত্রী) রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এলে যে"? আমি কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম, "কেন আমার আসা কি তোমার ইচ্ছা নয়!"

সরলা। তা কেন? তুমি এতদিন আস্‌বে আস্‌বে বলে আস নি, আমি মনে করেছিলুম যে তুমি আর এখানে আস্‌বে না।

আমি। যে যা চায় সে তাই মনে করে।

সরলা। তা হবে! এখন কি মনে করে আসা হ'ল?

আমি। লোকে আবার কি মনে করে বাড়ী আসে।

সরলা। তোমার তো আর এ নিজের বাড়ী নেই—এ তোমার পরের বাড়ী হয়েছে; এখন তুমি কলকেতার মানুষ হ'য়েছ—কলকেতা তোমার ঘর-বাড়ী।

এসব কথাবার্ত্তা স্ত্রীসুলভ বাক্‌চাতুরতায় কথিত হইলেও আমার অন্তরে গিয়া বাজিতেছিল। আমি সে সকল লঘুভাবে না

লইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিলাম। সরোষে বলিয়া উঠিলাম "যদি তোমার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে ত এখনই চলে যাচ্ছি" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পুত্রের আগমনে তখনকার মত গোলমাল মিটিয়া গেল।

যাহা হউক যে কয়দিন রহিলাম, ভারি মনের অসুখে কাটিল। আমার সর্ব্বদা মনে হইত যে সরলা আমার অন্তরের সমস্ত ছিদ্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে ও আমাকে ঘৃণা করিতেছে। বাটী আসিয়া প্রথম আমাদের মনোভঙ্গের গভীরত্ব অনুভব করিলাম। আমার অজ্ঞাতে আমার অন্তঃকরণের যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ পাইলাম। আমার মন কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিল। সে ব্যস্ততা আমি চাপিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে যে আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম; কারণ জনৈক বাল্যবন্ধু কথাপ্রসঙ্গে আমাকে ঐ কথা বলিয়াছিল। যে তিন চারিদিন ছিলাম, তাহাতে স্ত্রীর সহিত সামান্য সংসারের কথাবার্ত্তা ছাড়া অন্য কথা হয় নাই। শুধু স্ত্রী কেন—কাহারও সহিত আমি প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারি নাই। আমার হৃদয়ের দ্বারের মুখে যে একখণ্ড প্রস্তর আসিয়া পড়িয়াছিল সে প্রস্তর যে আমারই কৃত, তাহা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; আমি সকলকেই বিদ্বেষভাবাপন্ন দেখিতাম এবং তাহার আদৌ কোন কারণ নাই ভাবিয়া মনে মনে সকলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইতাম। পাপের চক্ষুতে যে শুধু দূরের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, কাছের কিম্বা নিজের ভিতরের দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

চারিদিন বাটীতে থাকিয়া আমি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় আমার প্রাণ একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব বিষাদে একেবারে অভিভূত হইয়াছিল। আসিবার সময় আমার পুত্র আসিয়া আমার হাঁটু জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল "বাবা যেতে পাবে না"। নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আমি বাটী হইতে চলিয়া আসিবার সময় আমার স্ত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করি নাই। পুত্র স্বতঃই কিম্বা তাহার মাতার ইঙ্গিতে আমার নিকটে আসিয়া এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না—তবে আমার স্ত্রীকে দালানের দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। আমার মনে অত্যাচারিতের ভাব তখনও যায় নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার স্ত্রী আমার সহিত প্রথমে কথা কহিয়া ত্রুটীস্বীকার করিবে! যে অমানুষ স্ত্রীলোকের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে চাহে, তাহাকে সংসারে পদে পদে অপদস্থ হইয়া উপযুক্ত দণ্ড পাইতে হয়, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাচীন জ্ঞানীরা নিঃসংশয়িত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমার পুত্র দৌড়াইয়া আসিয়া আমার জানুদেশ জড়াইয়া আমার দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল "না বাবা আমি তোমাকে যেতে দোব না"। আমি অনেক সময়ে নিষ্ঠুরতা-প্রকাশে দক্ষ থাকিলেও তাহার কথায় কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না; আমি একপ্রকার মানসিক অবশতা অনুভব করিতে লাগিলাম; দুঃখে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; চক্ষু জলে সিক্ত হইয়া গেল; কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলাম না; পরে চিত্তকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া পুত্রকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম

কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না; সে কোনও কথায় কর্ণপাত করিল না: কেবল "বাবা তুমি যেতে পাবে না" বারম্বার এই কথাই বলিতে লাগিল। আমি একবার মনে করিলাম যে তাহার কথাতে সম্মত হই কিন্তু পরক্ষণেই মনে করিলাম যে ইহাতে আমার স্ত্রীর নিকট আমার চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইবে। সে জন্য অতি কষ্টে মনের গতি পরিবর্ত্তন করিলাম। তাহাতে যেরূপ মানসিক বেদনা অনুভব করিলাম তাহা বোধ হয় শুধু পৃথিবী-ত্যাগী আসন্ন-মৃত্যু মানবেই উপলব্ধি করিয়া থাকে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা ফিরিলাম। তিন চারিদিন বড়ই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিলাম; পরে আবার বাটীর কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। এখন মনোরমার মা আমাকে খুবই যত্ন করেন ও প্রায়ই অনুপস্থিতিতে দেখাশুনা করার জন্য আমাকে অনেক ধন্যবাদ দেন ও মনোরমার নিকট হইতে আমার যে অশেষ কষ্ট ও অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের কথা শুনিয়াছেন তাহাও বলেন। মনে আছে, একদিন মনোরমা দূর হইতে পান রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া "অন্যায়" লজ্জা দেখাইবার জন্য তাহাকে অনেক স্নেহ-তিরস্কার করেন। এখন সে আমার সম্মুখে আসিতে ও সময়ে সময়ে দুই চারিটি কথাও কহিতে লাগিল।

ক্রমে এক সপ্তাহ গত হইতে না হইতে মেসে ম্যানেজারের সততার উপর সন্দেহ লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। অনেকের বিশ্বাস ম্যানেজার বাবু হিসাব পত্র ঠিক রাখেন না; তাঁহার চরিত্রহীনতার নাকি প্রমাণ পাইয়াও এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়াছিল। আরও সন্দেহের একটা বিশেষ কারণ যে, উক্ত ভদ্রলোক ম্যানেজারি ছাড়িতে চাহিতেন না। মেসের নিয়মানুসারে প্রত্যেক মেম্বরকে পর্য্যায়ক্রমে একমাস করিয়া ম্যানেজারী করিতে হইত; অনেক মেম্বর তাহা করিতে ইচ্ছুক হইত না; কিন্তু উক্ত ভদ্রলোক উপযাচক হইয়া তাহাদের স্থলে কাজ করিতেন। এইরূপ দুই চারি মাস করিবার পর তিনি স্থায়ী

ম্যানেজার হইলেন এবং সেই অবধি উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার উপর প্রথমে কাহারও সন্দেহ ছিল না; পরে জনৈক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীবাসী মেম্বরের প্রথমে সন্দেহ হয়, ক্রমে অনেক মেম্বরের অন্তঃস্থিত সন্দেহ জাগিয়া উঠে। ম্যানেজারের পক্ষে তাঁহার নিজদেশবাসী দুই চারিজন ব্যতীত সকলেই তাঁহার বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। অতিরিক্ত খরচ ও জঘন্য আহারের বন্দোবস্তে সকলেই অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন রাত্রে আহারের সময় মৎস্যখণ্ডের অনুবীক্ষণীয় ক্ষীণতায় একজন উত্তেজিত হইয়া স্পষ্টতঃ ম্যানেজারের অসততা সম্বন্ধে দোষারোপ করিল। ম্যানেজার নিকটে ছিলেন, খুব ঝগড়া হইল; এবং দুইপক্ষে হাতাহাতি এমন কি থানায় ডাইরী পর্য্যন্ত হইয়া গেল। বিপক্ষদল মেস ছাড়িয়া যাইয়া নূতন মেস স্থাপন করিবে স্থির করিল; আমিও ঐ দলের মধ্যে ছিলাম। মেসের ঠাকুরকে জবাব দেওয়া হইল; আর আমাদেরও "হরি মটর" আরম্ভ হইল। এই সকল কথা মনোরমার মার কানে পৌঁছিয়াছিল। তিনি অন্য মেসে যাইয়া "কষ্ট করা" অপেক্ষা অমত না হইলে তাঁহার বাটীর নীচের ঘরে থাকা ও তাঁহাদের বাটীতে আহারের প্রস্তাব করিলেন। আমি কুসংস্কারহীন যুবক,—আমার কাহারও সহিত আহারে আপত্তি ছিল না, সুতরাং আমিও বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিলাম এবং সেইদিনই বৈকালে তন্নীতন্নার সহিত সেই বাটীতে আসিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কার্য্য করিবার সময় আমার মনে আদৌ দ্বিধা বোধ হইল না যে আমি কি ভয়ানক গুহায় প্রবেশ করিতেছি; বরং মনে হইল যে ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত—তাহা না হইলে এতদিনের মেসই বা কেন উঠিয়া

যাইবে। মানব, অভীষ্টকার্য্য করিতে অগ্রসর হইবার সময় অনুকূল বিষয় ঈশ্বরের প্রেরিত মনে করে ও প্রতিকূল ঘটনা সকল কোন ক্রমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে,—খরস্রোতা নদীর ন্যায় অনুকূল বায়ুর সাহায্য গ্রহণ করে—কিন্তু পথরোধকারী শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া কিম্বা বেষ্টন করিয়া চলিয়া যায়। বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবানকে আমরা কখনও আমাদের কামনার রক্ষক, কখনও বা ইষ্টহন্তা মনে করি,—যেন ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোন কর্ম্মই নাই; কখন আমাদের চাটুকারের ন্যায় খোসামোদ করিতেছেন, কখন বা নীচমনা মানবের ন্যায় আমাদের ইষ্ট দেখিতে না পারিয়া তাহা নাশের জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত আছেন: আমরা স্বতঃই ভুলিয়া যাই যে আমাদের কর্ম্ম—আমাদেরই কর্ম্ম—তাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতির দ্বারা যেমন কতক অংশে নিয়মিত হয়, তেমনই তাহাকেও আবার কতক পরিমাণে নিয়মিত করিতে পারে। যাহা হউক আমার এই স্থানপরিবর্ত্তন ঈশ্বরানুমোদিত কার্য্য বলিয়া মনে করিলাম। আর মনে হইল ইহা আমার স্ত্রীর ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি। অজ্ঞ স্ত্রীলোক হইয়া আমার মত সুশিক্ষিত পতির সহিত যে এরূপ ব্যবহার করিতে সাহস পাইয়াছে তাহার পক্ষে কোন শাস্তিই যথেষ্ট নয়। এইরূপ মনোভাব লইয়া আমি নূতন বাটীতে প্রবেশ করিলাম।

আমি জিনিষপত্র রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু ঘণ্টাদুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, আমার সামান্য দ্রব্যাদি কি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। যেটি যেখানে রাখা আমার মনঃপূত, সেটি ঠিক সেইখানেই রাখা হইয়াছে। কে যেন আমার প্রাণের ভিতরের সন্ধান লইয়া ঠিক আমার মনোমত কার্য্য করিয়াছে! কে সেই প্রাণের প্রাণ! আহা কি সুন্দরভাবে বিছানা

প্রস্তুত হইয়াছে,—যেন বালিশ বিছানা চাদর ইত্যাদি নূতন দেখাইতেছে। আমার বইগুলি কে এমন করিয়া সাজাইল? যেখানি যথায় রাখিলে ভাল দেখায় ঠিক তাহা জানিয়াই যেন সেইখানে রাখিয়াছে। বইগুলি যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কি সুন্দর রুচি! টেবলক্লথ না থাকাতে তাহার স্থানে কাগজ দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে,—কিন্তু কি দক্ষতার সহিত! যেন মূল্যবান বস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর নয়নমুগ্ধকর হইয়াছে! দোয়াতটী ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। কলম দুটি তাহার উপর রাখা হইয়াছে। আমার দোয়াত রাখিবার কোন পাত্র ছিল না, দেখি একটী পরিষ্কার পোর্ সিলেনের পাত্রের উপর তাহা রাখা হইয়াছে ও একটি আগন্তুক পিন্‌কুসন্ আসিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। মনের অত্যধিক উৎকর্ষতা না থাকিলে কি বাহ্যবস্তুর চারু-সন্নিবেশের উপর এত দৃষ্টি থাকে? যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে এত মনোযোগ না জানি তাহার অন্তঃসৌন্দর্য্যে কি না দৃষ্টি! আমি শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা নারীর সংসার-কার্য্য সৌকার্য্যে প্রভেদ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার স্ত্রী সাংসারিক কার্য্যে খুব মনোযোগী ও পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় হইলেও অন্য কোন বিষয়ে বেশভূষা কিম্বা অন্য কোন বাহ্যদ্রব্যের 'চটকের' উপর—আদৌ নজর ছিল না। আর দুরদৃষ্টবশতঃ আমি সেই 'চটকই' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ মনে করিতাম ও তাহারই অভাব অশিক্ষিতের লক্ষণ বলিয়া ভাবিতাম। মনে হইল আজ আমি আদর্শ অন্তঃকরণের সন্ধান পাইলাম। প্রাণে নানাপ্রকারের চিন্তা একসঙ্গে প্রবলবেগে আসিয়া মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিয়া দিল। নানাপ্রকারের অপূর্ব্বানুভূত চিন্তা মনে উদয় হইল; দৃষ্টির প্রসার যেন ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল,—যেন চোখের

সম্মুখে এক বিস্তৃত পথের বহুদূর বিস্তীর্ণ সুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পথ দূরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে। নিকটে বেশ সমতল, শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষশোভিত ও শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিত—দূরে ঠিক দেখা যায় না। পথ ক্রমশঃ প্রান্তরের মধ্য দিয়া মরুভূমিতে পড়িয়াছে! কি ও সকল দেখা যাইতেছে? মনুষ্য-কঙ্কাল—ছিন্নমুণ্ড—ক্ষতবিক্ষত-দেহ—ডাকিনী যোগিনী তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে! মন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া গেল—কাছের টেবিলটা যেন একটা বিশাল গতপ্রাণ রাক্ষসের দেহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল; বইগুলা যেন নরকের দূত—আদেশের অপেক্ষায় সারি সারি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ভয়ে চক্ষু মুদিত করিলাম, তবুও যেন তাহাই দেখিতে পাইলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল। এমন সময়ে মনোরমার মা আসিয়া ডাকিল, 'বাবা, একলা বসে কি ভাবছ!' চমক ভাঙ্গিয়া গেল; আমি যেন অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিলাম 'না—কিছু নয়'। এইরূপ জাগ্রত স্বপ্ন দেখা যেন আমার রোগের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল। কতবার এইরূপ নির্জ্জনে ভবিষ্যতের ক্ষীণদৃষ্টি পাইয়াছি, কিন্তু তাহা ভাবোন্মত্ত মস্তিস্কের "খেয়াল" মনে করিয়া উড়াইয়া দিতাম। যখন তখন কি একটা অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশঙ্কা মন ছাইয়া ফেলিত। কতবার তাহার আগমন একেবারে বন্ধ করিব মনে করিয়াছি কিন্তু তাহা করিতে সমর্থ হই নাই। কখন চকিতে নির্জ্জনে কিম্বা কোলাহল মধ্যে তাহা আসিয়া ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার চলিয়া গিয়াছে।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাটীতে থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিলাম যে, গৃহস্বামিনীর ধাত্রীকার্য্যে মাসিক ৫০৲ টাকার অধিক রোজগার হয় না, কিন্তু খরচা তাহার তিনগুণের অধিক হইবে। কোথা হইতে ব্যয়-নির্ব্বাহ হয় সে চিন্তা দুই একবার আমার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমার সে আলোচনাতে কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া তাহা আর মনোমধ্যে স্থান দিই নাই। একদিন বেলা দশটার সময় বাটী হইতে বাহির হইব এমন সময় একজন পিয়ন একখানা insured চিঠি আমার হাতে দিল। উপরে ইংরাজিতে মিস্ হেনা বলিয়া লেখা আছে। ঠিকানা আমাদের বাটীরই বটে; আমি পিয়নকে বলিলাম বোধ হয় ঠিকানা ভুল হইয়া থাকিবে, এ বাটীতে এ নামের কেহ নাই। পিয়ন তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "দিদিবাবুর চিঠি, আপনি সই করিয়া লন কিম্বা দিদিবাবুকে পাঠাইয়া দিন।" ইহাতে মনে হইল নিশ্চয়ই এইরূপ টাকা বহুবারই আসিয়াছে; সই করিয়া চিঠি লইলাম। উপরে ছাপ দেখিলাম 'রাঁচির'—আগে একবার শুনিয়াছিলাম কর্ত্রী রাঁচিতে নিজ ব্যবসায় উপলক্ষে গিয়াছিলেন, এ সেই ফি'র টাকা হইবে। তবে Miss Hena কে? মনোরমার মা, Miss হইতে পারেন না, তবে ইহা মনোরমার অপর নাম হইতে পারে। প্রেরক ইহাদের কোন আত্মীয় হইবে; ইহারই সাহায্যে বোধ হয় ইহাদের সংসার এইরূপ স্বচ্ছন্দভাবে চলে। যাহা হউক এ নাম আমার

মোটেই ভাল লাগিল না। হেনা নামে—আমার মনে মনে গণিকাবৃত্তি জড়িত ছিল। সংশ্রবাত্মক নিয়মের গুণে ( Force of law of association ) নামধারিণী দুশ্চরিত্রা—ক্ষণিকের বিশ্বাস আসিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম কর্ত্রী গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। আমি তৎপর হইয়া চিঠি দিলাম ; তাহাতে যেরূপ ফল হইবে ভাবিয়াছিলাম তাহার উল্টা রকম হইল। কয়েকদিন তাহাদের খরচের এমন টানাটানি পড়িয়াছিল যে আমি পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি স্বভাবতঃই মনে করিয়াছিলাম যে টাকা পাইলে তিনি উৎফুল্ল হইবেন কিন্তু দেখিলাম চিঠির নাম পড়িয়া তিনি চমকিত হইলেন ও আমার হাতে চিঠি পড়িয়াছে বলিয়া একটু বিরক্ত হইলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। তিনি উপরে চলিয়া গেলেন আমিও ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আমার মনে কেমন একটা 'খট্‌কা' রহিয়া গেল। সেই আমার তাহাদের পরিবারের উপর প্রথম প্রকৃত সন্দেহ। সেই দিন হইতে আমি ইহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপ ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম। আমার সন্দেহ হয়ত একেবারে লোপ পাইত কিন্তু গৃহস্বামিনীর ব্যবহার তাহাকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। প্রায়ই দুই চারি দিন অন্তর তিনি হেনার কথা পাড়িতেন ও আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে হেনা তাঁহার ছোট মাসতুতো ভগ্নী। শৈশব হইতেই পিতৃমাতৃহীনা। তাহাকে তিনি মাতার ন্যায় পালন করিয়াছেন। তাহার এক খুড়া ব্যতীত দেখিবার আর কেহ নাই। এখন সে বাড়ী থাকে। মাঝে দুইচারি দিন সে কলিকাতায় আসিয়া তাহার বাসায় ছিল। এ সমস্ত খুব সাধারণ কথা, কিন্তু আমার অন্তর যেন সে সকল

কথা একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত না,—কোথায় একটু সামান্য অবিশ্বাস লুকাইয়া পড়িয়া থাকিত।

এখানে আসা অবধি প্রায় দেড় মাস কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, বাড়ীর কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছি—মাঝে মাঝে স্ত্রীর এক একখানা চিঠি আসে, তাহা একবার মাত্র পড়িয়াই ফেলিয়া দিই। এখন আমি একরকম নূতন রাজ্যে বিচরণ করিতেছি। কর্ত্রীর ও তাঁহার কন্যার যত্নের তুলনা নাই। আমি যেমনটি চাহিতাম ঠিক যেন তেমনটি মিলিয়াছে; মাঝে মাঝে পুত্রের জন্য মন খারাপ হইত বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া ব্যতীত আমার সহিত বাটীর আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। এই সময় একটী ভাব আমার মনের মধ্যে বড়ই প্রবল হইয়াছিল। যে ভাগ্যবান্ এই শিক্ষিতা রমণীর স্বামী হইবে, না জানি সে কতই সুখী হইবে। এই ভাবী স্বামীর ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হইত। আমার স্ত্রী জীবিত, আমার সহিত মনোরমার বিবাহের কথা আদৌ মনে আসিত না। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য চলিলেও তাহার জীবিতাবস্থায় পুনরায় দারপরিগ্রহের কথা মনে কখনও আসে নাই। আমার অন্ততঃ এইটুকু শিক্ষা হইয়াছিল যে একসঙ্গে দুই বিবাহ অতি আন্তরিক ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম। ইহাও বলিতে পারি যে আমার বিবাহের পথ পরিষ্কার হইবার জন্য কখনও স্ত্রীর মৃত্যুকামনা অন্তরের মধ্যে উদয় হয় নাই। আমার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জাশীলা কিম্বা গুণ্ঠিতমনা,—ইহাই আমার প্রধান আক্ষেপের বিষয় ছিল। কেন সে আমার সহিত মন খুলিয়া কথা কয় না, কেন তাহাকে চিরকাল বিয়ের ক'নের মত খোসামোদ করিয়া কথা কহাইতে হইবে, কেন তাহার অন্তর

একেবারে আবেগহীন, কেন সে একালের মেয়েদের মত স্বামীর সহিত ব্যবহার করে না, এই সব ভাবিয়া আমি যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইতাম। মনোরমার বাটীর সংস্পর্শে আসিয়া বিরক্তি ঘৃণার আকার ধারণ করিয়াছিল। পাড়ার সকল লোকই আমার স্ত্রীকে সুশীলা ও কর্ম্মিষ্ঠা বলিয়া প্রশংসা করিত। ইদানীং আমার সে প্রশংসা বড় ভাল লাগিত না। আবার মনে হইত আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া অন্য লোকের নিকট হইতে প্রশংসা অর্জ্জন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। একথা যে আমি কথন সত্য সত্য হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতাম তাহা এখন আমার আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তখন আমার মস্তিষ্কের নিশ্চয় আংশিক বিকার হইয়া থাকিবে, এবং পরে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এই বিশ্বাস আমার প্রত্যেক দিন প্রবলতর হইয়াছে। উন্মত্ততার এতপ্রকার আকার ও ক্রম ( degree ) আছে যে তাহা কোন না কোন আকারে বা ক্রমে ( degree ) অনেক লোকের মধ্যে বর্ত্তমান আছে একথা চিকিৎসকেরাও বলিয়া থাকেন। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে সচরাচর সাংসারিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও কোন কোন বিশেষ বিষয়ে প্রায় সংজ্ঞাহীন ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন। কেহ এমনি বেশ সহজ ব্যক্তির ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু কোন বিশেষ বিষয় উত্থাপন করিলে উন্মত্তের ন্যায় আচরণ বা কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হওয়া অবধি তাহার উপর বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে এত মজ্জাগত হইয়াছিল যে তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন বিচার কিম্বা মতামত প্রকাশ করিলে আমি একান্ত নির্ব্বুদ্ধির ন্যায় ব্যবহার করিতাম। শেষে এমন কি তাহার পবিত্র চরিত্রের উপর অবিশ্বাস পর্য্যন্তও জন্মিয়া

ছিল, ভাবিতাম, অন্যথা আমার সহিত ক্রমাগত এরূপ অবজ্ঞা-সহকারে ব্যবহার করিবার কোন কারণ নাই। তখন যাহা অবজ্ঞা মনে করিতাম এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি সেই মিতভাষিতা, ধীরতা ও জাড্যতা—নিঃস্বার্থ, অকৃত্রিম, পূততম প্রেমের নিদর্শন মাত্র। এই প্রেমের শ্রেষ্ঠতম আলেখ্য সেক্সপীয়রের কর্ডিলিয়ার ( Cordilia ) চরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। রাজা লিয়র ( Lear ) কন্যার যে অপরাধে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন আমিও কতক সেইরূপ দোষে আমার পত্নীকে মন হইতে দূরীভূত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। উভয়েরও অবস্থাভেদে প্রায় সমান দুর্গতি হইয়াছে। একজনের রাজ্যনাশ, প্রাণনাশ, প্রিয়তম বস্তুর ক্ষয় হইয়াছিল; আমিও পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় সমস্ত হারাইয়াছি; চরিত্র সম্পদ হারাইয়াছি, মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, এখন পাগলের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতেছি, পশুর ন্যায় কলিকাতার অন্ধ বস্তীতে দিন কাটাইতেছি। নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনের উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে।

নূতন টানে পড়িয়া একপ্রকার ভাসিয়া যাইতেছি। গৃহস্বামিনী ও তাহার কন্যা আমায় যেরূপ যত্ন করেন, আমিও তেমনি তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করি। দিনকতক হইতে কথাবার্ত্তা হইতেছে যে একবার আনন্দ-ভ্রমণে ( pleasure trip ) বাহির হইতে হইবে। তাহাতে কর্ত্রী অপেক্ষা তাঁহার কন্যার সমধিক ইচ্ছা। সম্মুখে Easterএর ছুটী নিকটবর্ত্তী—স্থির হইয়াছে এই সময় বাহির হইতে হইবে। কোথায় যাওয়া হইবে, কিরূপে ছুটীর সময় অতিবাহিত করা হইবে এই সব বিষয় লইয়া জল্পনা হয়। দেওঘর

সিমুলতলা, মধুপুর প্রভৃতির নাম উঠিল—সকলেরই দোষগুণ ধরা হইতে লাগিল কোনটীই পছন্দ হয় না; আলোচেনার মধ্যে মনোরমা এক একবার রাঁচির কথা উত্থাপন করে কিন্তু আমি দেখিলাম তাহাতে তাহার মাতা তাহার দিকে রুক্ষ দৃষ্টিপাত করাতে সে নিরস্ত হইয়া যায়। রাঁচির নামে বিরক্ত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। রাঁচির সহিত এই পরিবারের কোন রহস্য জড়িত আছে মনে হইলে কিন্তু এ পর্য্যন্তও তাহাদের উপর কোনরূপ সন্দেহ বেশীক্ষণ স্থান পাইত না। ইপ্সিত নব-পরিচয়ের প্রথম আবেগে আমার মন একদিকেই বহিতেছিল; তাহার গতি অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলে তাহা ক্ষণকালের জন্য সামান্য আন্দোলন উপস্থিত করিত মাত্র কিন্তু তাহা কাটিয়া গেলে মনের গতি আবার পূর্ব্বের মত দুর্দ্দমনীয়তা প্রাপ্ত হইত।

যাহা হউক অনেক বিচার বিতর্কের পর বিশেষতঃ ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্থির হইল যে, বাহিরে কোথাও যাওয়া হইবে না। ছুটীর ভিতর বোটানিক্যাল গার্ডেন ( Botanical Garden ) দক্ষিণেশ্বর, ডায়মণ্ড হারবার প্রভৃতি স্থানে জলপথে যাওয়া হইবে এবং সেখানে দিবাযাপন করিয়া রাত্রে ফেরা হইবে। ক্রমে ছুটী উপস্থিত হইল, প্রথমদিন নৌকাযোগে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়া হইল। সর্ব্বসমেত চারিজন লোক,—আমি, মনোরমা, তাহার মা ও ঝি—নৌকায় যথেষ্ট স্থান ছিল কিন্তু দৈবক্রমেই হউক বা কোন অজ্ঞাতশক্তিবলেই হউক মনোরমার স্থান আমার পার্শ্বে হইল। নৌকায় প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। প্রথম হইতেই গঙ্গার ঊর্ম্মিমালা দর্শনে তাহাকে বিষম আতঙ্কিত বলিয়া মনে হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী থাকাতে সান্ত্বনা করার সুখ-ভার আমারই উপর পড়িল। আমি ভয়ের কোন কারণ নাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আতঙ্ক যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অবশেষে ফেরি ষ্টিমার-উত্থিত এক প্রকাণ্ড ঢেউ দর্শনে সে সভয়ে সরিয়া যাইতে আমার উপর আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থান অধিকার করিল। আতঙ্কের সব ভাব বিশ্বাস না করিলেও এরূপ আমার বড় মন্দ লাগিতেছিল না। এরূপ আচরণ নারীর Up to date শিক্ষার লক্ষণ বলিয়াই অর্থ করিয়া লইলাম। এইরূপে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌছাইয়া বাগান ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমি যতদূর সাধ্য বৃক্ষগণের ইংরাজী ও ল্যাটীন নামের বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দিতে লাগিলাম। ঘণ্টা তিন ভ্রমনের পর নৌকায় করিয়া পুনরায় বাটী ফিরিলাম দুই একদিনের ব্যাপারে ইহাদের সহিত ঘনিষ্টতা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইল। মনোরমা আর পূর্ব্বের ন্যায় দূরত্বের ভাব দেখায় না। তাহার মা অনর্থক লৌকিকতা (Formality) রক্ষা করেন না, যেন আমি তাহাদের একপ্রকার সংসারভুক্ত হইয়া গিয়াছি।

দ্বিতীয় দিন আর কোথাও যাওয়া হইল না। তৃতীয় দিন পুনরায় নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হইল। দক্ষিণেশ্বরের নাম করিতে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কে জানিত যে এই পবিত্র শান্তিময় ভূমিতে আমার দ্বারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পাপকর্ম্ম সম্পাদিত হইবে? কলিকাতা আসা অবধি এই দক্ষিণেশ্বর আমার অতি প্রিয় বস্তু ছিল—ছুটী পাইলেই যাইতাম ও সকালে যাইয়া সমস্ত দিন যাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিতাম। ইহার প্রাচীন

বৃক্ষের ছায়া—শীতল স্নিগ্ধ বায়ু—শান্তিময় ভাবে প্রাণে যে অপূর্ব্ব আনন্দ জাগরিত করিয়া দিত তাহা বর্ণনাতীত। দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হইল বটে কিন্তু সেখানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই; কেবলমাত্র তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ে অনাস্থার ভাব দেখিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। তাহারা যেন ওখানে যাইয়া বৃথা দিনটা নষ্ট করিয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইল। সেখানে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে ইহাদের অন্তর হইতে ধর্ম্মভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন তাহাদের মধ্যে কোন দোষ দেখিলেই তাহা আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার আনুসঙ্গিক ও উপেক্ষণীয় কুফল বলিয়া ধরিয়া লইতাম।

সেইদিন রাত্রে আসিয়া একখানি চিঠি পাইলাম। পত্রখানি আমাদের গ্রামের জ্ঞাতি সম্পর্কে পিতৃব্য দ্বারা লিখিত। চিঠি খুলিয়া পড়িলাম। একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলাম তথাপি যেন সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পত্রে লেখা আছে, আমার স্ত্রী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত; জীবন সঙ্কটাপন্ন; দেখিবার কেহ নাই, ভাল চিকিৎসা হইতেছে না, শীঘ্র আসার বিশেষ প্রয়োজন। পত্র পাইয়া প্রথমে আমার সন্দেহ হইল। মনে হইল এ আমার স্ত্রীর ছল মাত্র—আমাকে বাটীতে লইয়া যাইবার কৌশল। প্রকৃতির দোষে সর্ব্ববিষয়ে মন্দটাই আগে আমার মনে আসিত এবং নিজ জীবনের ঘটনাবলী হইতে জানিয়াছি যে, আপনাকে যন্ত্রণা দিতে এমন নৈতিক ব্যাধি আর জগতে দ্বিতীয় নাই। সুখী হইতে হইলে অনেক সময়ে মন্দের দিকটা প্রথমে ছাড়িয়া দিয়া ভাল দিক ভাবিয়াই কার্য্য করা উচিত এবং সকলেই নিজ নিজ জীবনে কমবেশ বুঝিয়াছেন যে অনেক সময়ে মানসের

এইরূপ বৃত্তি হইতে প্রতিদিনের কত জটীল সমস্যা সরল হইয়া থাকে। পত্রের সত্যতা লইয়া আমার মনে অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল। আমি আমার খুড়ার হস্তাক্ষর চিনিতাম, পত্র যে তাঁহার লেখা তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তবে চিঠির অকৃত্রিমতার উপর সন্দেহ কিসের? আমার খুড়া কখন কোন ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারেন না; তবে সন্দেহ কেন? স্বভাবের দোষ! যাহা হউক বহু চিন্তার পর ঠিক হইল বাস্তবিকই আমার স্ত্রী পীড়িত। রাত্রে ট্রেণ ছিল, যাইতে পারিতাম। সে ট্রেণে না যাইয়া পরদিন দ্বিপ্রহরের ট্রেণে যাইলাম; ইচ্ছা করিলে রাত্রের ট্রেণে যাইতে পারিতাম কিন্তু ততদূর প্রবলেচ্ছা হইল না। কয়েক মাস হইতে আমার চরিত্র, নগরবাসীর স্বাভাবিক নীচহৃদয়তা ও অমানুষত্ব বেশ অধিকার করিয়াছিল। নচেৎ কোন্ পাষণ্ড এরূপ সংবাদে স্থির থাকিতে পারে? যতদূর মনে আছে নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। স্বপ্নে শুধু মনোরমার হাস্যমুখ দেখিয়াছিলাম। পরে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, যতক্ষণ রোগ চাপিবার ক্ষমতা ছিল ততক্ষণ আমার স্ত্রী সে কথা কাহাকেও বলে নাই ও যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ ঔষধও গ্রহণ করে নাই।

আমি যখন নিহৃদয় নিদ্রায় ও সুখস্বপ্নে মগ্ন তখন আমার স্ত্রী ভীষণ বিসূচিকা রোগের অন্তিম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ও দারুণ বিকারের মধ্যে বারংবার "আমার সঙ্গে একবার দেখা করলে না" বলিয়া চীৎকার করিতেছে! সেদিনকার পাশবিক নির্ম্মতার জন্য কি আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে? কখনই না। শত জন্ম কষ্টভোগ করিলেও তাহা হইবার নহে। হিন্দু-পতির অসীম ক্ষমতা পাইয়া আমি বিনা দোষে এক সতীরত্নকে নিষ্পেষণ করিয়া মারিয়াছি। পরে

শুনিয়াছিলাম যে আমার ব্যবহারে শেষে হতাশ হইয়া সে আহার-নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিল। কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া বাক্যালাপ করিত না। নিজের প্রাণের দহ্যমান ক্ষোভ-অগ্নি চাপিয়া রাখিয়া নিজেকে ইন্ধনবৎ ভস্মসাৎ করিয়াছিল।

আমি পরদিন দুপুরের ট্রেণে বাড়ীতে রওনা হইলাম ও সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে পৌছাইলাম। গাড়ীতে আমি কোনরূপ মানসিক উদ্বিগ্নতা অনুভব করি নাই; বরং এরূপ অসময়ে রোগভোগের জন্য আমি রোগিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছিলাম। একদিকে সংবাদ-দাতার পত্রের অকৃত্রিমতার উপর সন্দেহ, অন্যদিকে কলিকাতা ত্যাগ জনিত ব্যথা এবং তাহার উপর আবার অশুভ সংবাদে স্বাভাবিক নিরানন্দতায় মন একেবারে বিচলিত করিয়াছিল। বিরক্তি প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় যখন আমি গ্রাম্যপথ দিয়া যাইতেছি তখন এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "হ্যাঁরে কাল বৌটা তোর জন্যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে ম'ল, আর তোর একবার দেখবারও সময় হ'ল না; হ্যাঁরে কলকাতায় গিয়ে একেবারে বাড়ীর কথা ভুলে গেছিস্‌?" তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে সময় আমি কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছি সেই সময়েই আমার স্ত্রী ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। মৃত্যুসংবাদের আকস্মিকতায় আমি প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, পরে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস জন্মিল স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদে প্রাণে ক্ষণেকের জন্য আঘাত লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ঘণ্টা কয়েক পরেই আমার প্রাণে যন্ত্রণা অপেক্ষা সুস্থতাই অধিক পরিমাণে অনুভব করিয়াছিলাম। মনের লাঘবতা অনুভব করিলাম—যেন এক বিষম

সমস্যার সমাধান হইয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার হইয়াছে। পথ ত পরিষ্কার হইয়াছে! এ ঘটনা হইতে আমার ধ্বংসের পথ যে রীতিমত পরিষ্কার হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্য-শরীরধারী পশু আমি—স্ত্রীর চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই আরামের চিত্র দেখিয়াছিলাম! সে চিত্র যে ঘোর মরীচিকায় পরিণত হইবে তাহা ত প্রকৃতি-ধর্ম্মানুমোদিত। সেই অস্বাভাবিক সুখ-স্বপ্ন প্রেতরূপ ধারণ করিয়া আমার জীবনের প্রতি শঙ্কট-স্থলে আসিয়া মুখব্যাদান ও অট্টহাস্য করিয়া দেখা দিয়াছে। প্রতিবার বলিয়াছে "কি, অধার্ম্মিকতা হইতে সুখ খুঁজিবে না? পরের যন্ত্রণা হইতে আরাম লভিবার ইচ্ছা করিবে না? আমাকে পাইতে চাহিয়াছিলে না? কেমন, আমার অস্থিমজ্জা-পেষণকারী স্পর্শ কেমন লাগে? আমার বিরাট কদাকার ও রুক্ষ আলিঙ্গনের ভয়ে এত জড়সড় হও কেন? আমার স্পর্শে লবণস্পর্শী জলৌকার মত ছট্‌ফট্‌ কর কেন?"

বাটী পৌঁছিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। হারুকে এক প্রতিবেশিনী সান্ত্বনার নিমিত্ত স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। হারুকে না দেখিয়া মনে হইল যে আমার স্ত্রী সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার অমূল্য রত্নকে অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে! আমার উপর বিশ্বাসের অভাবের জন্যই এইরূপ করিয়াছে! দেখিতে দেখিতে হারু আসিল। তাহার প্রথম ব্যবহারে আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম সে কাঁদিয়া অধীর হইবে কিন্তু সে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিল। সান্ত্বনার জন্য কে তাহার হাতে একখানি ছবি দিয়াছিল; সে ছবি ফেলিয়া দিয়া সজোরে আমার দিকে ধাবিত হইল ও 'আমার বাবা এসেছে'

'আমার বাবা এসেছে' বলিয়া আমার হাঁটু জড়াইয়া ধরিল। আমাকে দেখিয়া তার মার মৃত্যুর কথা ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গিয়া আনন্দে আত্মহারা হইল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাহার মা'র কথা পাড়িল—মা কোথায় গেল, মা আবার কবে আসবে, মাকে কেন দেখ্‌লে না, মা কেন রাগ ক'রলে—এইরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি তাহার প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে কিম্বা তাহাকে কোনরূপ সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না। নানাপ্রকার চিন্তা আমাকে একপ্রকার বুদ্ধিহীন করিয়া তুলিয়াছিল।

কলিকাতায় আমার মন পড়িয়াছিল। পরদিন প্রাতে আমি আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। পুত্রকে এক হীনাবস্থা দূরসম্পর্কীয়া জ্ঞাতিপ্রতিবেশিনীব নিকট রাখিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। অতি অল্পবয়স্ক হইলেও হারু তাহা যেন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছিল। সে কিছুতেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। আমি কত রকমে তাহাকে অন্যত্র পাঠাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। একবার মনে করিলাম তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিব কিন্তু তাহাতে ভরসা হইল না। কি জানি যদি তাহাতে আমার নবজাত অমূল্য প্রেমাভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটে। আমার পিতৃস্বসা ইতিপূর্ব্বেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। সংসারে একমাত্র পুত্র ব্যতীত আর কেহই নাই। কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে এ অবস্থায় কেহ পুত্রকে একা ছাড়িয়া যাইতে পারিত না; কিন্তু মোহ আমার উপর এরূপ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল যে আমি তাহাই করিলাম। আমি পুত্রের এইরূপ অযথা আব্দার দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলাম, শেষে রীতিমত জোর করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হাত ছাড়াইয়া এক প্রতি-

বেশিনীর কাছে সমর্পণ করিয়া আসিলাম। আসিবার সময় তাহার কি কান্না—'আমি বাবার সঙ্গে যাব.' 'বাবা! আমাকে ফেলে যেও না,' 'বাবা! আমি মরে যাব,' 'ওমা, বাবাকে নিয়ে যেতে বল' ইত্যাদি হৃদয়বিদারক বাক্যে কতই কাঁদিল। সে যেন তখনই প্রকৃত পিতৃমাতৃহীন হইল। আমার কানে সে সকল কথা ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া বাজিতে লাগিল; বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তথাপি কি যেন অদৃশ্য শক্তিতে আমাকে কলের পুতুলের ন্যায় কলিকাতার পথে টানিয়া লইয়া যাইল।

ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম অতি অল্পই সময় আছে; তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইব এমন সময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমি হ্যাণ্ডেল ধরিয়া উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলাম। চাকার তলায় পড়িয়া গেলে তখনই সব 'শেষ' হইয়া যাইত। একটি যুবক গাড়ীর ধারে বসিয়াছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। আমি বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম যে আমার প্রাণ-রক্ষক যুবককে যেন বহু পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। পরে কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম যে সে আমার সহাধ্যায়ী বিমল। আজ ৬ বৎসর পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাহার সহিত কয়েক মাস মাত্র F. A. classএ পড়িয়াছিলাম। তাহার পিতা U. P.তে ডাক্তারি করিতেন। সেইখানেই সে প্রবেশিকা পাশ করিয়াছিল। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তথাকার জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় আবার U. P.তে গমন করিয়াছিল এবং তথা হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া এখন এলাহাবাদে উচ্চ বেতনে চাকুরি করিতেছে। ছুটীতে কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে যাইতেছে। কিছুক্ষণ আলাপের পর তাহার সহিত পূর্ব্বের বন্ধুত্ব যেন

পুনস্থাপিত হইল। তাহার কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিলাম যদি সুবিধা মনে হয় ত কলিকাতায় থাকিয়া প্রাক্‌টিস করিবে। সে আমাকে কলিকাতার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে আমি মনোরমাদের বাটীর ঠিকানা বলিলাম। তাহা শুনিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল ও অকস্মাৎ তাহার নির্ম্মল বদন যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কি একা এ বাটীতে থাকেন'? আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম "না, উপরে একজন Midwife থাকেন, আর আমি নীচের তলায় থাকি। সে এ বিষয় লইয়া আর বেশী কথাবার্ত্তা কহিল না। তাহার পর হইতে যেন তাহার পূর্ব্বের সারল্য (frankness) দূর হইল। আর বেশী আলাপ হইল না, কিন্তু আমার মনে ইহাতেও কিছু সন্দেহ হইল না। আমরা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দুইজনে পরস্পরকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিলাম। কলিকাতায় আসিয়া মনের পূর্ব্বাবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইল; চারি ঘণ্টায় কোথা হইতে কোথায় আসিলাম! কোথায় সেই পল্লীগ্রামের দুপুরবেলার গভীর নিস্তব্ধতা, আর কোথায় এই মহানগরীর সান্ধ্য কল্লোল; কোথায় সেই রৌদ্রময় দুস্তর মাঠ, পত্রপুষ্পময় বৃক্ষ ও পূত মৃৎগৃহ, আর কোথায় এই কৃত্রিমদীপোজ্জ্বল শকটকোলাহলপূর্ণ আকাশস্পর্শী প্রস্তরাত্মক হর্ম্ম্য! আমার গ্রামে যে মনের অবস্থা হইয়াছিল তাহা অনেকটা অলীক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মানুষকে নির্ম্মম করিতে, তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে কলিকাতার ন্যায় স্থান ভারতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। এখানকার যা কিছু আছে তাহা যেন মনকে কেবলই বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ভিতরে তার অনুসন্ধান করিবার অবসর

আদৌ নাই। ফলতঃ মন ক্রমেই এখানকার নানাবিধ বাহ্যিক শক্তির দাস হইয়া পড়ে, তাহার ভিতরের শক্তি কমিয়া আসে; অনেক সময়ে একেবারেই লোপ পায়। এই অবস্থায় কলিকাতার লোক এক একটি যন্ত্রের সমান। কেহ ধনোপার্জ্জনের যন্ত্র, কেহ বা নাম জাহির করিবার ঢকামাত্র; আর কেহ বা নানারূপ কুৎসিৎ লালসা ভোগের আত্মহীন কীট বিশেষ।

রাস্তা ধরিয়া যাইতে যাইতে রেলগাড়িতে বিমলের সহিত দেখা ও তাহার অসামঞ্জস্য ব্যবহারের কথা মনে হইতে লাগিল। কেন তাহার সরলতা ( frankness ), মনোরমার বাটীর সহিত আমার সংস্রব জ্ঞানে, সঙ্কোচে ( reserve ) পরিণত হইল? মন তোলাপাড়া হইতেছে, বিমলের ও মনোরমার মুখশ্রীর সাদৃশ্য আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ইহারা কি ভ্রাতা ভগ্নি? তাহা হইলে মনোরমা কলিকাতায় এরূপ অবস্থায় থাকিবে কেন? যাহাকে মনোরমার মা বলিয়া জানি সেই বা কে? এ সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইবামাত্র মনোরমার মা বাটীর খবর জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। যথারীতি সান্ত্বনা দিলেন বটে কিন্তু একটি কথা না বলাতে আমার মন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল। আমার পুত্রের সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কিম্বা তাহাকে আনাইবার জন্য কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু অদ্য হইতে আমার উপর তাহাদের যত্নমাত্রা খুব বাড়িয়া গেল। আমি স্ত্রীবিয়োগের দুঃখ শনৈঃ শনৈঃ ভুলিতে লাগিলাম।

---

# নবম পরিচ্ছেদ

দু চার দিন যাইবার পর একদিন সকালে উঠিয়া দেখি যে নীচে কতকগুলি জিনিষপত্র পড়িয়া আছে। এগুলি কি জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম যে ইহাদের একটি পরিচিত লোক রাঁচী হইতে আসিয়াছে। তিনি দুই চারিদিন কলিকাতায় থাকিবেন। বোর্ডিং বা মেসে জায়গা না পাওয়ায় তাঁহাকে অগত্যা এখানে উঠিতে হইয়াছে। আমি জানিতাম উপরে একখানি ব্যতীত শুইবার ঘর ছিল না। সে ব্যক্তি কাল কোথায় ছিল জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হইল। বেলা একটু বাড়িলে দেখিলাম হ্যাট কোট পরা এক ব্যক্তি বাহির হইয়া গেল। তাহার পরণে short trouser, full stocking এবং এক লালচে রঙ্গের কোট, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর, দাড়ি ও গোঁফের তিনভাগ কামান, চোখ দুটো ফুলো ফুলো ও জ্যোতিহীন এবং তাহার নীচে কাল কাল দাগ পড়িয়াছে। অমসৃণ বদন, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ উদর, অনুন্নত বক্ষ ও স্ফীত চক্ষু দেখিলে লোকটাকে ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ও অনাচারপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। তাহাকে দেখিবামাত্রই আমার মনে এক বিদ্বেষভাবের উদ্রেক হইল। দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া আছি এমন সময় এই লোকটী আমার সহিত আলাপ করিতে আসিল। পরিচয়ে জানিলাম লোকটীর নাম গোপাল সিংহ। কয়েক বৎসর মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন, উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এখন রাঁচিতে ডাক্তারি করিতেছেন। মনোরমার পিতা তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন, সেই

জন্য ইহাদের দেখাশুনা করিতে হয়। কথায় বুঝিলাম তিনি আমার বিষয় সব শুনিয়াছেন। আমার স্ত্রী যে সম্প্রতি মারা গিয়াছে তাহাও তিনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন। আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে একবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি আমায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার পরামর্শ দান করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম তিনিও মৃতদার ও বিবাহ না করায় অত্যন্ত 'পস্তাইতেছেন'। শেষে মনোরমার সহিত আমার বিবাহ হইলে একজন দুঃস্থ স্ত্রীলোকের সাহায্য করা হইবে এবং আমারও পক্ষে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না। আমি বেশীর ভাগ নিস্তব্ধভাবে তাহার কথা শুনিতেছিলাম। শেষদিকে তাহার আলাপ আমার এই বিবাহের কর্ত্তব্যতা ও সত্বরকরণীয়তা সম্বন্ধে একরূপ ওকালতিতেই পরিণত হইল। তাহার সহিত আলাপে আমার সকালের মনের ভাব কতকটা অপনোদন হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দূর হইল না। আমার যেন মনে হইল এই লোকটিকেই প্রথম দিন সন্দেহজনকভাবে বাটী হইতে তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি ও এই লোকটির কণ্ঠস্বর একদিন তাহাদের বাটীতে শুনিয়াছিলাম। আমি তাহাকে পূর্ব্বে এ বাটীতে আসার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিলেন, তাহাতে ঠিক করিলাম আমি অন্য কোন লোককে দেখিয়া থাকিব। যে দুই দিন এই লোকটি কলিকাতায় ছিল, তার প্রত্যেক দিনই দুই চারিবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইত ও তিনি আমাকে এ বিবাহে সম্মতি দান করিতে এমন পীড়াপীড়ি করিতেন যে আমার সন্দেহ হইত, বুঝি বা মনোরমার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির করিবার জন্যই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি দেখিতাম মনোরমার

সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা। তিনি মনোরমাকে 'তুই মুই' করিয়া ডাকিতেন, কখন টানিয়া কোলে বসাইতেন। তাহা আমার মোটেই ভাল না লাগিলেও এ সব তাঁহার সরল ব্যবহার বলিয়া মনকে জোর করিয়া বুঝাইতাম। ভিতরে ভিতরে মনোরমাকে বিবাহ করিতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। বিবাহ করিলে ছেলে 'পর' হইবে কি না ভাবিয়া কখন কখন দ্বিধা বোধ করিতাম। যাহা হউক, কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গোপাল সিংহ আমাকে বিবাহে সম্মতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আন্দাজ তিন মাস পরে একটি তারিখে বিবাহের দিন স্থির হয়; কিন্তু একমাস না যাইতে যাইতেই গোপাল বাবু পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন এবং নানা কারণ দর্শাইয়া সেই সপ্তাহেই একদিন আমাদের বিবাহের দিন স্থির করিলেন। সেই সকল কারণ আমার কোনটাই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হইল না, কিন্তু নিজের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হওয়ায় আমি অবশেষে তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। সেই সপ্তাহে মনোরমার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল ও আমার বিষ-পান আরম্ভ হইল।

আমি যে অমৃত ভ্রমে গরল পান করিয়াছি, তাহা অতি সত্বরেই বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বে ভাবিতাম আমার প্রথমা স্ত্রী শিক্ষিতা না হওয়াতেই আমি গার্হস্থ্য-জীবনে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারি নাই। আমি তাহার আড়ম্বরশূন্য কর্ত্তব্যপালন ও বাক্যহীন প্রেমাভিনয় অশিক্ষিত প্রাণের অসম্যক অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিতাম। ভাবিয়াছিলাম আধুনিক ফ্যাসানজ্ঞাতা, কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করিলে না জানি কতই সুখী হইতে পারিব। একবারও ভাবি নাই পরম্পরাগত সামাজিক দেশধর্ম্ম (tradition )

ও জাতীয় সহজজ্ঞান ( instinct ) অলক্ষিতে কত উচ্চ আদর্শের কার্য্য করে; যাহা ইংরাজিশিক্ষাভিমানীরা ভ্রমাত্মক ধারণা এবং কুসংস্কার বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাহা কত পাপ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করে। তখন বুঝি নাই আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা অনেক বিষয়ে প্রশংসনীয় হইলেও তাহা পাপপ্রতিরোধক অনেক জন্মগত বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিষেধক দান করিতে পারে নাই।

বিবাহের অতি অল্পদিন পরেই আমি মনোরমার যথার্থ প্রকৃতির বিষয় অবগত হইতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে তাহাকে দুই একবার মা'র সহিত ঝগড়া করিতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে কলহ আমাকে দেখিয়াই যেন দুই পক্ষ যত্ন করিয়া নির্ব্বাপিত করিয়াছিল; তাহা হইতে আমি কাহারও দোষগুণ বুঝিতে পারি নাই। এখন মাতা কন্যার কলহ হইতে দুজনেই যে অতি রুক্ষস্বভাবা তাহা বুঝিতে পারিলাম কিন্তু হঠাৎ উহাদের মধ্যে মনোমালিন্যের নূতন কি কারণ ঘটিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কি কারণে মাতার কন্যার উপর এরূপ বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে, কন্যাই বা মাতার উপর এত অসন্তুষ্ট কেন? কেহ যেন কাহাকেও দেখিতে পারে না, কাহারও কথা আদৌ সহ্য করিতে পারে না। দুজনেই সর্ব্বদা বিমর্ষ হইয়া থাকে। কখনও কথাবার্ত্তা হইলে প্রায়ই ঝগড়ায় পরিণত হয়। দুজনেই যেন মনে করে যে অপরের দ্বারা তাহার অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। আমার সম্মুখে তাহারা কলহ না করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিত, কিন্তু উভয়ের ভিতরের উষ্ণতা অনেক সময়ে বাহির হইয়া পড়িত। ঝগড়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে এরূপ সময় আমি উপস্থিত হইলে তাহারা মনের বেগ

হঠাৎ থামাইতে পারিত না। আমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাইতাম। একদিন এইরূপ হঠাৎ আসিয়া পড়িলে নীচে হইতে শুনিলাম মা অতি ক্রোধভরে কন্যাকে বলিতেছে "তুই মেয়ে হ'য়ে এমন শত্রুর কাজ করিবি তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আগে জানলে আঁতুড় ঘরে মুন গিলিয়ে মেরে ফেলতুম।" কন্যা কি উত্তর করিলে মা আরও ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, "ফের চোব্‌রা কর্‌বি ত জামাইকে সব কথা বলে দেবো।" এইবার কন্যার উত্তর শুনিতে পাইলাম এবং যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার শিক্ষিতা নারীর স্বামী হইবার সাধ খুব মিটিয়া গেল! কন্যা বলিল "বলে দেনা, ও আমার কি করবে, আমি ত ভারি কেয়ার করি। অমন ভাতার আমার রাস্তায় দু'দশটা গড়াগড়ি যাচ্ছে।" আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, উপরে গিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "একি তোমাদের রোজ রোজ ছোটলোকের মত ঝগড়া, একটু লজ্জা করে না?" তাহাতে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিল, "মুখ সামলে কথা কবে, তুমি আমাকে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে পাওনি, যে সব সহ্য করে যাব, তোমার মতন ভাতার আমি অনেক দেখেছি।" আমিও রাগান্বিত হইয়া উত্তর করিলে, সে আমার চৌদ্দপুরুষ, জন্ম, দেশ প্রভৃতি ধরিয়া বংশবোনাস্তি গালি দিতে কসুর করিল না। অভিনয় অনেকদূর গড়াইত, কিন্তু মাতা আসিয়া নিরস্ত করিল। আমি নীচে আসিয়া বসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম যে আজ হইতে ঠিক প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। আমি এরূপ স্ত্রী লইয়া যে কিরূপ সুখী হইব, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পরিলাম। আমি নিজেকে সহস্রবার ধিকার দিতে লাগিলাম। আমার প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, তাহার উপর অকারণ রূঢ় ব্যবহার, তাহার

শেষ সময়ে অনুপস্থিতি প্রভৃতির স্মৃতি আসিয়া আমাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ তাহার মৃত্যুতে আমি যে আরাম জ্ঞান করিয়াছিলাম, তাহা যেন পিশাচের আকৃতি ধারণ করিয়া অট্টহাস করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল ও বলিতে লাগিল 'ভাবিয়াছিলে না, যে তোমার স্বাধ্বী স্ত্রীর মৃত্যুতে তুমি আমাকে লাভ করিবে, এখন দেখিতেছ আমি তোমার কোথায় লইয়া আসিয়াছি! আজ তোমাকে সুখের কিঞ্চিৎ আস্বাদন দিলাম। পূর্ণ আস্বাদনের এখন অনেক বাকি!' আমার যেন হঠাৎ চক্ষু ফুটিয়া গেল, আমার স্ত্রীর আড়ম্বরশূন্য স্বাধ্বীত্বের কথা জ্বলন্ত অক্ষরে আমার মানসপথে দেখা দিল। আমার তৃপ্তির জন্য গোপনে কি প্রাণপণ চেষ্টা, আমার দুঃখে প্রাণে কি বাক্যহীন বেদনা, আমার সুখে কি আন্তরিক আনন্দ, সংসারের কর্ত্তব্যপালনে কি তন্ময়তা! এতদিন এই সকল গুণের বিপরীত অর্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন প্রকৃত সত্য বুঝিতে পারিলাম। মনে পড়িল যেদিন আমার পিতৃ-বিয়োগ হয়, সেদিন তাহার মুখে কি ঘন বিষাদের ছায়া দেখিয়া-ছিলাম; যেন আমার পৃথিবীর প্রকৃত বন্ধুবিয়োগে সে অন্তরতম প্রাণে ব্যথিত হইয়াছে! মনে পড়িল যেদিন বি, এ, পাসের খবর বাড়ী পৌছায়, সেদিন তাহার সরল বদন কি বিপুল আনন্দের স্নিগ্ধজ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল! এখন তাহার যাহা কিছু আচার, ব্যবহার, বাক্য, কার্য্য সকলই সৌন্দর্য্যময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এরূপ স্ত্রীকে আমি হত্যা করিয়াছি,—নৃশংসভাবে তিল তিল করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি! আমার অপেক্ষা জঘন্য অপরাধী পৃথিবীতে আর কে আছে? এ হত্যার প্রায়শ্চিত্ত কি? কোথায় এর সম্যক শাস্তি হইবে? ভাবিলাম মনোরমা ঠিক করিয়াছে।

দুর্ব্বাক্য না বলিয়া পদাঘাত করিলেও আমার শাস্তি হইত না। স্ত্রীর শেষ বাক্য, "আমাকে একবার দেখ্‌লে না" মনে পড়িল; বার বার সেই বাক্য কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—করুণ হইতে করুণতর স্বরে, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর বাক্যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিল, প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। রক্ত গড়াইয়া যেন চোখের কাছে আসিল, কিন্তু অশ্রু বাহির হইল না, অন্তরের উষ্মতায় সব শুকাইয়া যাইতে লাগিল। আবার সেই বাক্য "আমায় একবার দেখ্‌লে না"! মনে হইল একবার দেখিলেই যেন সে বাঁচিত! এখনও একবার দেখিয়া আসি! ভাবিলাম কি দেখিব, শ্মশানে সব ভস্ম হইয়া গিয়াছে! এখন তাহার মৃত্যুর জন্য মনোরমাকে দায়ী ঠিক করিলাম। এ পিশাচীর মোহে না পড়িলে ত আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইত না। হইতে পারে আমি দুর্ব্বলচিত্ত, কিন্তু এই রাক্ষসী কেন আমায় পাপ পথে টানিয়া লইয়া যাইল? আমার পিতামাতা ধরিয়া গালি মনে পড়িল, রক্ত ফুটিয়া উঠিল, ভাবিলাম এইক্ষণেই স্ত্রীহত্যা করিব। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখি টেবিলের উপর একখানা রুলার পড়িয়া আছে,—ধরিয়া উঠিতে যাইতেছি, এমন সময়ে যেন সম্মুখে সরলার শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্ত্তি দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে তাহা অন্তর্হিত হইল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। এতক্ষণ প্রবল মানসিক উষ্মতা যে অশ্রু রোধ করিয়াছিল, তাহা সরলার স্নিগ্ধমূর্ত্তির ছায়ায় যেন দ্রবীভূত হইয়া শতধারে বাহির হইল। আমি প্রাণের আবেগে বালকের ন্যায় কাঁদিলাম। কতক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে যেন প্রাণে কিঞ্চিৎ লাঘবতা অনুভব করিলাম। কতক্ষণ কাঁদিলাম তাহা বলিতে পারি না। কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রা আসিয়াছিল। যখন জাগিলাম, দেখিলাম

মনোরমার মা ডাকিতেছেন, আহারের জন্য উপরে যাইতে বলিতেছেন। আমি ঘুমের ঘোরে সহজ ব্যক্তির ন্যায় উপরে যাইলাম, কিন্তু মনোরমাকে দেখিয়া সে ঘোর কাটিয়া গেল। তাহার মা আমাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া সান্ত্বনা দিলেন—একরূপ মিটমাট হইয়া গেল।

ইহার দিনকতক পরে আমি গ্রামের এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম। প্রতিবেশী আমার পুরাতন বন্ধু। পত্রে আমার পুত্রের দুর্দ্দশার কথা লিখিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। পত্রে লিখিয়াছেন "হারুকে যেখানে রাখিয়া আসিয়াছ তাহারা বড় অযত্ন করে, দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পর্য্যন্ত পায় না তাহার ছিন্ন বস্ত্র, মলিন দেহ, রুক্ষ কেশ, বিষণ্ণ মুখ দেখিলে তাহাকে পথের কাঙ্গালের ছেলে বলিয়া মনে হয়। পাড়ার ছেলেরা তাহার সহিত ঝগড়া করে ও প্রায়ই প্রহার করে। সে 'বাবা বাবা' বলিয়া কতই কাঁদে, কিন্তু কে তাহার চীৎকার শুনে! তাহাকে দেখিবার কোন লোক নাই। আমি জিজ্ঞাসা করাতে তোমার প্রতিবেশী বলিল যে খরচ পাঠান হয়, তাহাতে আজকাল একটা ছেলের খরচা চলে না। যদি তাহার উপর তোমার কোন মমতা থাকে, তাহা হইলে তোমার পুত্রকে সত্বর লইয়া যাইবে নতুবা সে মারা যাইবে", ইত্যাদি বন্ধু অনেক কথা লিখিয়াছেন। পত্র পড়িয়া আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল আমার হারুর এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে আর আমি কিছুই খবর রাখি নাই! ভাবিলাম আমি স্বামীর যথার্থ কার্য্য ত করিয়াছি, এইবার পিতার উপযুক্ত কার্য্য করিতেছি! পুত্র দিনরাত 'বাবা, বাবা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে আর আমি তাহার

কথা একবারও ভাবি নাই। আমি আপন পিতামাতার উপর দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিতেছি, ও সেই প্রয়োগকারিণী শিক্ষিতা বলিয়া আমি তাহার সহিত পুনরায় প্রণয়স্থাপন করিতেছি ও পৃথিবীর সকলের উপর কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছি! "পথকাঙ্গালীর ছেলে"—পত্রের এই কথাটি বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। বন্ধু ঠিকই লিখিয়াছেন। পথকাঙ্গালের অপেক্ষা আমার পদ কিসে উন্নত! মনোরমা ত সেদিন স্পষ্ট বলিয়াছে, আমার মত স্বামী রাস্তায় কত গড়াগড়ি যায়! মনোরমা ত ঠিকই বলিয়াছে! যার ছেলে পথকাঙ্গালের ছেলের ন্যায় ক্ষুধিত হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সে আবার কোন্ কাজে স্বামী হইবার উপযুক্ত? যে পিতা হইয়া কর্ত্তব্য পালন করে না, সে স্বামী হইয়া স্ত্রীর নিকট কিরূপে কর্ত্তব্যপালনের আশা করে? পুত্রের দুর্দ্দশা স্মরণে চক্ষে জল আসিল। তাহার সহিত শেষবিদায়ের কথা স্মরণ করিয়া বক্ষ চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠিক করিলাম কালই তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিব। মনোরমা ও তাহার মায়ের কাছে এ কথা পাড়িলাম। তাহাতে তাহাদের, বিশেষতঃ মনোরমার, বিষম আপত্তি দেখিলাম। সমস্ত বিষয়, বন্ধুর পত্রের কথা, সবিস্তর বলিলাম; তাহাতে মনোরমার মন কিছুই নরম হইল না। পূর্ব্বদিনের মত ঝগড়া হইবার উপক্রম হইল। আমি উপর হইতে নীচে চলিয়া আসিলাম। অকূল সাগরে পড়িলাম, কি করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার পুত্রকে কলিকাতায় আনা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু রাখি কোথায়? মনোরমার গৃহ তাহার জন্য অর্গলবদ্ধ। আর আমার সামান্য আয়ে তাহাকে কি করিয়া অন্যত্র রাখি? আর অন্যত্র রাখিলে

আমাকে এই স্থান ত্যাগ করিতে হয়—মনোরমার সঙ্গে একটা ছাড়াছাড়ি অবশ্যম্ভাবী। এই এক মাস বিবাহ হইয়াছে—এরই মধ্যে ছাড়াছাড়ি, লোকে বলিবে কি? সে কথা মনে হইতেই যেন আমি বন্ধুবর্গের বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টি, ব্যাঙ্গাত্মক মুখ দেখিতে পাইলাম ও সে চিন্তা হইতে নিরস্ত হইলাম। আমার কেবল মনে হইতে লাগিল পুত্রকে মনোরমার এ বাটীতে রাখিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? আমি ত চেষ্টা করিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না হঠাৎ সেদিনকার মাতা কন্যার ঝগড়ার কথা মনে পড়িয়া একটা সন্দেহের ছায়া সৃষ্ট হইল—আমি শিহরিয়া উঠিলাম! মানুষ যেমন বিষাক্ত সর্প দেখিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমার মনও সেইরূপ বিষময় সন্দেহের কবলে কবলিত হইবার পূর্ব্বে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভগবান! আমাকে রক্ষা কর! আমি মনকে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত করিবার জন্য তথা হইতে উঠিয়া গেলাম।

বিবাহের পর হইতে প্রায়ই মনোরমার পীড়ার কথা শুনিতাম। তাহার সহিত প্রথম ঝগড়া হইতে তাহার পীড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। পীড়া যে কি তাহা আমি ঠিক জানিতাম না। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গা বমি বমি ইত্যাদি পাকস্থলী সংক্রান্ত কোন পীড়া। আমি ডাক্তার দেখাইবার কথা দুই একবার বলিয়াছিলাম তাহাতে তাহারা বড় গা করিত না, আমিও পুত্রের চিন্তায় ব্যস্ত থাকাতে তত মনোযোগও দিতে পারিতাম না।

বন্ধুর পত্র পাইবার পর হইতেই আমার দিন রাত একমাত্র ভাবনা—আমার হারুর কি ব্যবস্থা করি,—কলিকাতায় লইয়া আসিব, না আসিব না। আর যদি কলিকাতায় আনা হয় তবে কোথায় রাখি? একবার ভাবিলাম আমার বন্ধুর বাটীতে রাখিবার

বন্দোবস্ত করিয়া আসি, আবার পরক্ষণে মনে পড়িল যে অধিকাংশ সময় বন্ধু পল্লীগ্রামে থাকেন না। কলিকাতায় বোর্ডিং হাউসে রাখিবার কথা যে মনে হয় নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহার ব্যয় সাধ্যাতীত হওয়ায় ও তাহার উপর আমার বরাবর একটা মন্দ ধারণা ( prejudice ) থাকাতে তাহা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইল অনেক চিন্তার পর হারুকে কলিকাতায় আনা স্থির করিলাম। সকল বিষয়ের সমস্যা সমাধান করিয়া ঠিক হইল যে এই বাসার নীচের ঘরে আমি ও হারু থাকিব। বাহিরে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। এক সঙ্গে আহারে যদি মনোরমার ও তাহার মায়ের অমত থাকে, তবে আমি আর হারু নীচে ষ্টোভে রন্ধন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিব। ইহাতে একদিকে যেমন হারুকে কলিকাতায় রাখা হইবে ও মনোরমার সহিত প্রকাশ্যভাবে পৃথক হইতে হইবে না, তেমনি অন্যদিকে ব্যয়ের সঙ্কুলান হইবে। একটা সমস্যার সমাধান করিয়া মনে যেন সুস্থতা বোধ করিলাম। হারুকে কাছে রাখিবার সুখ যেন তখন হইতেই অনুভব করিলাম। তাহাকে রীতিমত যত্ন করিয়া তাহার মা'র উপর অত্যাচারের পাপ কতক স্খলন করিতে পারিব ভাবিয়া আশান্বিত হইলাম।

কিন্তু সে মানসিক ভাব বেশীক্ষণ রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক পত্র পাইলাম; এ পত্র লিখিয়াছেন আমার সেই প্রতিবেশী যাহার নিকট হারুকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "তোমার ছেলে বড় দুরন্ত, সে কাহারও কথা শুনে না, সামান্য জ্বর হইয়াছে বলিয়া সে উঠে না, কিছু খায় না, তুমি শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাইবে।" সামান্য জ্বরের কথা লেখা থাকিলেও আমার

মনে কেমন এক আতঙ্ক হইল, যে হারুর কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়া হইয়া থাকিবে। আমি তখনই মনস্থির করিলাম ও সেই রাত্রেই বাটী রওনা হইলাম, প্রাতঃকালে বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম। যাইবার সময় কেবল মনে হইতে লাগিল আর বুঝি হারুকে দেখিতে পাইব না। প্রতিবেশীর বাটীতে পৌঁছাইয়া দেখি হারু এক অন্ধকার ঘরে, ভিজে মেজের উপর ছিন্ন মাদুরে শুইয়া আছে, গায়ে এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র। এরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশী অপেক্ষা নিজের উপরেই বেশী ক্রোধ ও ঘৃণা হইল। আমি যখন নিজের ছেলের যত্ন লই না, তখন অন্য লোকে লইবে কেন? হারুর অবস্থা সাংঘাতিক, কিন্তু এত শীঘ্র যে সে তাহার পিশাচ পিতাকে ছাড়িয়া যাইবে তা আদৌ মনে করি নাই। বিকার আক্রমণ করিয়াছে—হারু যেন নিদ্রায় অভিভূত—মধ্যে মধ্যে 'মা' 'বাবা' বলিতেছে ও ভুল বকিতেছে। আমি নাম ধরিয়া দুই তিনবার ডাকিলাম, কোন সাড়া পাইলাম না—গা নাড়া দিয়া ডাকিলাম, হারু চমকাইয়া উঠিল ও চক্ষু মেলিল। আমি নীচু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছ, বাবা", সে আমায় চিনিতে পারিয়া, "বাবা" "বাবা" বলিয়া সাগ্রহে গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার ক্ষুদ্র বাহুতে যে অত শক্তি, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই! তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল যে সে কত আগ্রহের সহিত আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল! যেন এই অধমকে দেখিবার জন্যই প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে দেয় নাই! কতক্ষণ হারু আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল, ক্রমশঃ বাহু শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল! আবার প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রলাপের মধ্যে যেন সে তার মার সহিত কথা কহিতেছে। কখন

বলিতেছে "মা! বাবা এসেছে"; কখন বলিল "মা! কেঁদ না, বাবা আবার আসবে; মা! তুমি বস, বাবাকে ডেকে আনছি" ইত্যাদি। বালকের কথা শুনিয়া তাহার শিশুপ্রাণে তাহার মার উপর আমার দুর্ব্যবহার কিরূপ দারুণ আঘাত করিয়াছিল তা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি আবার হারুকে ডাকিলাম, কিন্তু সে আর আমার কথায় সাড়া দিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে "মা" "মা" ডাকিতে ডাকিতে, চক্ষু কপালে তুলিয়া, চিরকালের জন্য তাহা মুদিত করিল। আমি "হারু" "হারু" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। হারু যে এত শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে, তাহা আমি কোনদিন ভাবি নাই। হারু কোন উত্তর দিল না। সে চিরকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছে! যাহাকে কোথায় রাখিব বলিয়া এত ভাবনা, ভগবান তাহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন! আর তাহার জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, বিরক্ত হইতে হইবে না। হারুর স্থির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যেন ঘুমাইতেছে। মাতৃ-বিয়োগের পর হইতে বাছা আমার কত কষ্টই পাইয়াছে! অনাহারে অবহেলায় জর্জ্জরিত হইয়াছে! তাহার মা তাহাকে এত কষ্ট পাইতে দিবে কেন? তাই তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র ডাকিয়া লইয়াছে! হারুর সেদিনকার কথা মনে পড়িল, যে দিন তাহাকে ছাড়িয়া আসি তাহার সেই হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন, আমার সঙ্গে আসিবার জন্য মর্ম্মভেদি অনুনয়, প্রাণপণ চেষ্টা! আমার বক্ষে আগুণ জ্বলিতে লাগিল! এমন নির্ম্মম পিতার এরূপ স্নেহবান পুত্র হয়? হারু আমার নিকট কখন মূল্যবান দ্রব্য চায় নাই, শুধু চাহিয়াছিল একটু স্নেহ, একটু যত্ন, তাহাও তাহার এই নিষ্ঠুর পিতা দিতে পারে নাই! আমি যে পথের ভিখারী তাহা সত্য, সে ভিখারী-পুত্রের ন্যায়ই মরিয়াছে!

তাহার ছিন্নবস্ত্র ও শয্যার দিকে চাহিয়া আমি আমার অযত্নের মাত্রা অনুভব করিলাম! আমি মানুষ হইলে তাহার এ দশা হইবে কেন? আমি মোহবশতঃ তাহাকে ত্যাগ করিয়া না আসিলে সে এ অবস্থায় মরিবে কেন? আইনে এরূপ পাপের দণ্ড দেয় না, কিন্তু ন্যায়তঃ ইহার জন্য হত্যার পূর্ণ দণ্ড হওয়া উচিত। আমি শুধু আত্ম-ধিক্কার অনুভব করিলাম না, নিজের উপর ক্রোধ হইল, মনে হইল এ পাপের দণ্ড আমি নিজেকেই নিজে প্রদান করিব! এমন ছেলের উপর এই অত্যাচার! হারুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি যেন বাছা কত কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! বাছার যেন আমার উপর কোন রাগ নাই, যেন সে তাহার নরাধম পিতাকে শেষ সময় দেখিতে পাইয়া তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে! আমি কতক্ষণ বসিয়া কতরকম ভাবিলাম, বাছা যদি দয়া করিয়া ফিরিয়া আসে, তবে এবার কর্ত্তব্যের পূর্ণপালনে তাহার অযত্নের প্রায়শ্চিত্ত করি! হারু চলিয়া যাইল, পৃথিবীতে আর আমার কে রহিল? কে আর আমাকে কর্ত্তব্যের পথে—ধর্ম্মের পথে—ঠিক রাখিবে? কয়েক দিন হইতে হারু আমার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়াছিল। যেন একখানা পাপের বিশাল ছায়া আমার চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল! আমি অন্ধপ্রায় হইয়া চলিতেছিলাম—শুধু হারুর প্রতি কর্ত্তব্য আমাকে কতকটা রাস্তা দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল! এখন সে জ্যোতিও নির্ব্বাপিত হইল—আমি চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম, আমার জীবনের সব লক্ষ্য নাশ হইল! সম্মুখে নরকের অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! প্রতিবেশী আসিয়া বলিল 'আর ভাবিয়া কি হইবে; সৎকারের ব্যবস্থা কর'। আমি চমকাইয়া উঠিলাম, পিতা হইয়া পুত্রের শেষ-

কাজ করিতে হইবে! তাহার শেষ কার্য্যে আমার আগ্রহ হইল! বক্ষে বহন করিয়া হারুকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইলাম। সেখানে তাহার মাতার ভস্মবক্ষে চিরকাল তরে তাহাকে তুলিয়া দিলাম। যতক্ষণ চিতাগ্নি জ্বলিতেছিল, ততক্ষণ আমার বক্ষের আশাগ্নিও ধুক্ ধুক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহার চিতাগ্নিও নির্ব্বাপিত হইল, আমারও প্রাণের আশা, ভরসা সব নিবিয়া গেল, জীবনের লক্ষ্য মুছিয়া গেল, আমার জীবনের নৈতিক—আধ্যাত্মিক রশ্মি অন্তর্হিত হইল। বক্ষ একটা বিশাল শূন্যতায় পূর্ণ হইল। জীবনের চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও কিছু দেখা যায় না, শুধু একদিকে এক রাক্ষসী দাঁড়াইয়া, দৃশ্য ভয়ঙ্কর হইতে ভয়ঙ্করতর করিতেছে। আমি সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, বাছার শেষ বিশ্রামভূমি হইতে উঠিতে ইচ্ছা হইল না। কত কি ভাবিলাম, সে কোথায় গিয়াছে, তাহার মার সঙ্গে কি দেখা হয় নাই, তাহার আত্মা আছে, না বাছার সর্ব্বস্ব এই ভস্মে পরিণত হইয়াছে! কেবল মনে হইতে লাগিল হারু কি আর আছে, কি প্রকার আছে, সে আমায় দেখিতেছে, আমার কথা মনে আছে, অথবা থাকিলেও তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—না সে বিশ্ব-আত্মায় মিলিয়া গিয়াছে। যে সকল প্রশ্ন কখনও মনে স্থান পায় নাই, যাহা এতদিন আমার কাছে শুধু পুস্তকের পৃষ্ঠায় সমাহিত ছিল, আজ সে সকল আমার কাছে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল, আমি সে সকল প্রশ্ন লইয়া অকূল পাথার ভাবিলাম। কতক্ষণ ভাবিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ 'হরিবোল' শব্দে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখি আর এক হতভাগ্য তাহার পুত্রকে দাহ করিতে আসিয়াছে। তাহার

কান্না দেখিয়া অশ্রুতে আমার চক্ষু ভরিয়া গেল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিবেশীর বাটীতে ফিরিলাম। সেই রাত্রি সেখানে যাপন করিলাম।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে কলিকাতায় আসিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। প্রথমে যাইতে মন সরিল না। মহা চিন্তা উপস্থিত হইল—কি করা যায়, কোথায় যাই, কলিকাতায় যাইতে হইলে মনোরমার নিকট ব্যতীত আপাততঃ অন্যত্র স্থান কোথায়? আর মনোরমার নিকটই বা যাই কি করিয়া? সেত পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্ব্যবহার করিবে! বোধ হয় তাহা করিবে না, সে কি আমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার কথা আদৌ ভাবিবে না? নিশ্চয়ই ভাবিবে, পূর্ব্বে আমার সহিত সে যেরূপই ব্যবহার করিয়া থাকুক না কেন, এখন আমার দুঃখ দেখিয়া, তার সমবেদনা আসিবেই—যাহা হউক কিছু কিছু শিক্ষা ত পাইয়াছে? সে একেবারে পাষাণহৃদয়া হইতে পারে না; আমি তাহার নিকট যাইয়া নিশ্চয় শান্তি লাভ করিব। আবার ইহার বিপরীত কত কথা মনে হইতে লাগিল। যখনই তাহার উচ্চারিত দুর্ব্বাক্য সকল মনে হইতে লাগিল, তখন মন সে দিকে যাইতে চাহিল না। কিন্তু এইরূপ মানসিক দ্বিধার মধ্যে আমি কলিকাতা যাইবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিলাম। কি একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। হায়! আমি যদি সেদিন কলিকাতার জন্য যাত্রা না করিতাম, তাহা হইলে হয়ত আমার এ দুর্দ্দশা হইত না, আমাকে নরনারীর হত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হইত না! হয়ত অনেক দুর্ভাগা স্বামীর ন্যায় লোভনীয় অজ্ঞানে জীবন কাটাইতে পারিতাম!

হয়ত ঘোর অপ্রিয় সত্যের বিষময় পানীয় আমাকে গলাধঃকরণ করিতে হইত না! সেদিন আমার দুরদৃষ্টই আমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। ট্রেণে বসিয়া আমার হারুর ও আমার জন্মস্থান সেই পল্লীগ্রামের জন্য প্রাণ গভীরভাবে কাঁদিয়া উঠিল। কাল হারুকে হারাইয়াছি ও আজ আমার স্নেহময়ী পল্লীজননীকে চিরতরে হারাইলাম। সেই অবধি আমি পল্লীবাটীতে পদার্পণ করি নাই। পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া আমার মন সেখানে যাইতে ভরসা করে নাই। সে শান্তিময় স্থানের পবিত্র বায়ুকে আমার এই বিষময় নিশ্বাসে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি নাই। আমি যতই কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই প্রাণের বেদনা গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল ও মনোরমার নিকটে শান্তিলাভের আশা স্পষ্টতর রূপ ধারণ করিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, মনোরমা কতই না দুঃখ করিবে, কতই না সমবেদনা প্রকাশ করিবে, আমি তাহাতে আবার স্ব-কল্পিত দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইব; সে তাহার সহধর্ম্মিণীর উচিত-ব্যবহারে পূর্ব্বরূঢ়তার স্মৃতি মুছাইয়া দিবে। হায়! কে জানিত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সকল মূঢ় আশার অঙ্কুর অদৃষ্টের ব্যঙ্গ হাস্যে উৎপাটিত হইয়া, নরকযন্ত্রণার চিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে!

আমি কলিকাতায় পৌছাইয়া পদব্রজে বাটীর দিকে যাইতে লাগিলাম, খুব দ্রুতই যাইতেছিলাম। কতক্ষণ মনোরমার সহিত দেখা হইবে ও তাহাকে বলিয়া আমার মনের দুঃখের হ্রাস করিব! আমার দ্রুত গমনে ও ভাবনায় মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্ত চালনা হইয়াছিল, মুখ চোখ মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল। বাটীর সম্মুখে আসিয়াই দেখি, একখানা ঘরের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। উহার

ভিতর একজন ভদ্রলোক আছেন, বাহিরে মনোরমার মা দাঁড়াইয়া আছে ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছে। আমি সেইখানে দাঁড়াইবামাত্র ভদ্রলোকটী আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল "করুণাবাবু, আপনার সঙ্গে মনোরমার বিয়ে হয়েছে শুনেচি; মনোরমা আমার দূর সম্পর্কে ভগ্নি, যাহাই করুক, বিপদে পড়লে, না দেখে থাকতে পারি না। ওর অসুখ কিছুই নয়—advanced pregnancy—আর কিছুই নয়।" আমিও সে ভদ্রলোকটিকে তখন চিনিতে পারিলাম। ইনিই আমার সহাধ্যায়ী বিমল, পূর্ব্বে আমাকে রেলের গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইবার সময় রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি তখনই বলিয়াছিলেন কলিকাতায় prctice করিবেন। আমি বিমলের কথা শুনিয়া চকিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, যেন তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিমল আবার বলিয়া উঠিল, "ভাবনার কোন কারণ নাই; পাঁচ ছয় মাস pregnancy (গর্ভ) হ'লে এইরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়।" এই বলিয়া বিমল গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাল। কোন কথা না বলিয়া কলের পুতুলের ন্যায় উপরে গেলাম, দেখিলাম ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে, ভিতরে আলো অল্প অল্প জ্বলিতেছে, মনোরমা খাটের উপর শুইয়া রহিয়াছে, একজন লোক তাহার খাটের উপর বসিয়া মুখের উপর মুখ অবনত করিয়া কি বলিতেছে। পিশাচীর আলিঙ্গনে সেই লোক আবদ্ধ! আমি এত শীঘ্র ফিরিব, তাহারা আদৌ আশা করে নাই। দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতি সংগোপনে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সেই নরাধম গোপাল সিংহ। কোন কথা হইবার আগেই আমি দ্রুত গিয়া সেই পাষণ্ডের গলা টিপিয়া

ধরিলাম। সেই মুহুর্ত্তেই তাহার পাপের সমুচিত দণ্ড দিতাম কিন্তু সেই রাক্ষসী আসিয়া তাহাকে সে যাত্রা রক্ষা করিল। গলা ধরিলে যেমন সে উঠিতে যাইবে, অমনি নীচে পড়িয়া গেল, আমি যেমন তাহাকে আবার ধরিতে গেলাম, অমনি তাহার প্রণয়িনী আসিয়া আমাকে বাধা দিল ও সেই সুযোগে সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। আমি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে পিশাচীর মার নিকট বাধা প্রাপ্ত হইলাম। শিকার অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া, প্রতারণাকারিণীর কথা মনে পড়িল। তখন আমার মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল, আমি পিশাচিনীর প্রাণ নাশের উদ্দেশে উপরের দিকে ছুটিলাম; দেখিলাম, সে ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আমি দরজায় দুই চার বার ধাক্কা মারিলাম, দরজা খুলিল না। ইতিমধ্যে তাহার মা 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলিয়া চীৎকার করাতে বাটীর সম্মুখে লোক জড় হইল। তাহাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্না মা বলিল, 'কিছুই নয় বাবা, জামাইএর মাঝে মাঝে এরূপ মাথা গরম হয়ে থাকে।' সে ভদ্রলোক আমাকে শান্ত করিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন। আমি কতক দূর তাহার সঙ্গে আসিলাম; পরে হেদুয়াতে আসিয়া বসিলাম; পুতুলের ন্যায় আসিয়াছিলাম, পুতুলের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। তড়িতের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে কি হইয়া গেল, কিছুই অবধারণা করিতে পারিলাম না। আমি কতক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় অভিভূত হইয়া রহিলাম। হেদুয়ার শীতল বায়ুস্পর্শে ধূমায়মান মস্তিষ্ক কতক পরিমাণে শীতল হইল ও আমার অবস্থার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। হায়! আর যদি মস্তিষ্কের সহজ অবস্থা ফিরিয়া না আসিত, তাহা হইলে এই পলে পলে

নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। কলিকাতার অগণ্য বিকৃত-মস্তিষ্কের ন্যায় আমিও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাহারাও বোধ হয় আমার ন্যায় দুর্ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া সংজ্ঞাহারা হইয়াছে। তবে তাহারা আমাপেক্ষা অনেক সুখী, তাহাদের আমার ন্যায় স্মৃতির অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হায়! যদি ইচ্ছা করিলে স্মৃতি লোপ করিবার উপায় থাকিত, তবে অনুতাপের কত বৃশ্চিক দংশন, হতাশের কত বিকট আক্রমণ, বৃথা আশার কত প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত! তাহা হইলে সেই ক্ষিপ্তকারী দৃশ্য—স্ত্রীর আলিঙ্গনাবদ্ধ অধরস্পর্শী প্রণয়ীর চিত্র আমাকে ক্ষণে ক্ষণে উন্মাদ করিতে পারিত না। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে আমার জীবন-নাটকের প্রধান ঘটনা সকল একে একে স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আমার প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, তাহাকে অবহেলা, মনোরমার সহিত পরিচয়, তাহার উপর আসক্তি, স্ত্রীর মৃত্যু ও তাহার মৃত্যুতে আনন্দলাভ, মনোরমার সহিত হঠাৎ বিবাহ, অযত্নে পুত্রের মৃত্যু, শেষ দৃশ্য—মনোরমার অসতীত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ! ভাবিলাম নাটকের সমাধান ( denouement ) বেশ সুচারুরূপেই হইয়াছে! আমি শিক্ষিতা রমণীর প্রেমলাভের জন্য যেমন অবহেলার দ্বারা আমার সাধ্বী স্ত্রীর ও স্নেহবান পুত্রের পলে পলে আয়ুনাশ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে সেই শিক্ষিতা স্ত্রীকে তাহার প্রণয়ীর আলিঙ্গনবন্ধনে দেখিতে হইবে তাহা ত খুবই সমীচীন! আমি ইহারই মোহে পড়িয়া অন্তিমশয্যাশায়িনী স্ত্রীকে দেখিতে যাই নাই, যখন "আমাকে দেখ্‌লে না" বলিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল তখন সে কথায় কর্ণপাত করি নাই। আমি ইহারই

মন পাইবার বৃথা আশায় অমন পুত্রের খোঁজ লই নাই, যখন সে অযত্নে রাস্তায় কুকুরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহার একবার সংবাদ লই নাই! আমি যে সকল পাপের পাপী, মনোরমা তাহার তুলনায় পুণ্যচারিণী! মনোরমা শুধু স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছে, আর আমি স্ত্রী, পুত্র, জগৎ, মনুষ্যত্ব, বিধাতা সকলের নিকট ঘোর অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছি! এইরূপ দানবের উপর এই সকল ঘটনা ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্ত্রীর আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রণয়ী!—একি আমার ন্যায় পাপী ব্যতীত অন্যকে চাক্ষুষ দেখিতে হয়! আমার সেই দৃশ্য মনে পড়িল! সব ভুলিয়া গিয়া প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। ইহার জন্য সব বিসর্জ্জন দিলাম, আর সে কি এই তাহার প্রতিদান দিল? আবার স্ত্রীহত্যার দিকে মন ধাবিত হইল। উঠিতে গিয়া আবার কি মনে হইল—বসিলাম, ঠিক করিলাম সে যেমন আমায় পলে পলে দগ্ধ করিয়াছে; সেইরূপ আমিও তাহাকে পলে পলে দহন করিব! এই স্ত্রাপুত্রহত্যার জন্য সেই দায়ী! ইহারই প্ররোচনাতেই এই সব করিয়াছি। আমি ত পুত্রকে কলিকাতায় আনিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, পাপীয়সী তখন নিজের পাপ পাছে বাহির হইয়া পড়ে, সেই জন্যই আনিতে দেয় নাই। আর সেই পশুর আমার বিবাহ দিবার জন্য অযথা আগ্রহের কারণ বুঝিতে পারিলাম; কেন হঠাৎ বিবাহ কার্য্য সমাধান হইল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম; মার সহিত মনোমালিন্য, অহরহ ঝগড়ার মর্ম্ম জ্ঞাত হইলাম! সে পশু প্রথমে মাতা, পরে কন্যার প্রণয়ী হইয়া উঠিয়াছিল। কন্যার গর্ভলক্ষণে মা তাহাতে নিশ্চিত হইয়াছিল, সেই জন্য মার কন্যার উপর বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ঘৃণায় প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এরা কি মানুষ না

শৃগাল কুকুর বিশেষ? ভাবিলাম অজ্ঞাতকুলশীল বংশে বিবাহ করিয়া কি মূর্খের ন্যায় কার্য্যই করিয়াছি! এখন হিন্দুদের বিবাহের পূর্ব্বে কুলের ও বংশের পরিচয় লইবার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। আগে জানিতাম না, এখন জানিতে পারিয়াছি যে, কলিকাতায় কত না-হিন্দু, না-ব্রাহ্ম, বাঙ্গালী শৃগাল কুকুরের ন্যায় জীবন ধারণ করিতেছে। স্বামী স্ত্রী বিকাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, পিতা কন্যার রূপ বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতেছে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য—শুদ্ধ প্রাণ ধারণের জন্য নরনারী কি না করিতেছে! পাশ্চত্য দৃষ্টান্তের অনুসরণে লোকের অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, এ দিকে অভাব দূরীকরণের উপায় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, কাজে কাজেই অভাব মোচন করিতে যাইয়া নাগরিকেরা অনেক ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। শত সহস্র স্থলে দেখিয়াছি, কলিকাতার লোক অর্থের জন্য—শুধু প্রাণ ধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত অর্থের জন্য—যাহা করিতে প্রস্তুত, পল্লীগ্রামে যাহারা অনশনে দিন কাটাইতেছে, তাহারা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। ক্রমাগত চারিদিকে অনাচার ও পাপক্রিয়া দেখিয়া এখানে লোকের মনে পাপকর্ম্মে আর ঘৃণার উদ্রেক হয় না। এখন পাপ আর পূর্ব্বেকার পাপ নাই। অসতীত্ব চরিত্রগত দুর্ব্বলতা মাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়! যুবক যুবতীর অবৈধ প্রণয় স্বাভাবিক আকর্ষণের অভিব্যক্তি বলিয়া গণ্য হয়! ক্রমে কলিকাতায় একদল বাঙ্গালী সৃষ্টি হইতেছে, তাহারা না-হিন্দু, না-ব্রাহ্ম, না-ক্রিশ্চান; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ ব্রাহ্ম বা ক্রিশ্চান থাকিলেও তাহারা এখন আর ব্রাহ্ম কিম্বা ক্রিশ্চান নয়, কারণ ব্রাহ্ম বা ক্রিশ্চানের দলে চলিতে পারে না, তাহারা প্রয়োজনমত সকল ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয়

দিয়া থাকে। ইহাদের কোনপ্রকার পাপে অনাস্থা নাই, কারণ ইহাদের ধর্ম্মও নাই, সমাজও নাই। ধর্ম্মের ও সমাজের যে সকল প্রভাব মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিসকল নিয়ন্ত্রিত করে, ইহাদের কাছে তাহাদের অস্তিত্বই নাই। ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার থাকিলেও সে শিক্ষা ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ায়, কুশিক্ষার ন্যায় কার্য্যকারী হইয়াছে। ইহারা হিন্দুত্ব না মানায় বিবাহের আধ্যাত্মিকতা মানে না। ব্রাহ্ম না হওয়ায় বিবাহিত জীবনের দায়িত্বের আদৌ জ্ঞান নাই। ইহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বাধীনতা প্রয়াসী হইতে গিয়া যথেচ্ছাচারগামী হইয়াছে। আমি ভ্রমে এই ঘৃণিত দল হইতে স্ত্রী মনোনীত করায় কি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছি! এখন উপায় কি? উপায় স্থির করিতে যাইয়া চিত্ত বিকল হইয়া উঠিল। আত্মহত্যা না স্ত্রীহত্যা? দুইয়ের একটা—এ ছাড়া তৃতীয় পন্থা নাই, মনে হওয়ায় প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। আত্মহত্যা করিব? না এখনও সময় হয় হয় নাই। আমি স্ত্রী ও পুত্রের উপর যে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহার এখনও সমুচিত শাস্তি হয় নাই। পলে পলে সমস্ত জীবন এই বিষ-পানের যন্ত্রণা ভোগ করিলে তাহা হইবে কিনা সন্দেহ! এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে এখন আমার এক অদ্ভুত পিয়াসা ও আনন্দ উপস্থিত হয়। মনে হয় তাহাতে আমার পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয় ও পরকালের পথ পরিষ্কৃত হয়। তারপর আমার মত পাপীদের দণ্ড এখনও বাকী আছে। সেই পশু আমার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়াছে। সেই পাপীয়সীর প্রতারণার ও বিশ্বাস-ঘাতকতার কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। সে দুজনকে মনে পড়িলেই তাহাদের সেই বাহুপাশে আবদ্ধ অবস্থার কথা মনে পড়ে!

শিরায় শিরায় অনল প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম, মনে হইল তখনই যাইয়া তাহাদের সেই অবস্থা চিরস্থায়ী করিয়া দিই! আবার পরক্ষণে মনে হইল কোথায় তাহাদের পাইব? সে কুক্কুর ত তখনই পলাইয়াছে, কুক্কুরী কি আমার তাড়না খাইতে এখনও সেখানে আছে? আমি বেঞ্চ হইতে উঠিয়াছিলাম, আবার বসিলাম। শিকার হাত হইতে পলাইয়াছে ভাবিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ভাবিলাম, ভগবান কি কখনও দিন দিবেন না, যে দিন তাহাদের উষ্ণরক্ত পাত করিয়া প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিব? তখন কে জানিত যে যখন হতাশায় তাহাদের অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়াছিলাম, তখনই ভগবান তাদের দুজনকেই একস্থানে মিলাইয়া দিবেন। যেরূপভাবে আমি দুজনের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছি, অবৈধ প্রণয় যাহাতে লোকসমাজের নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার জীবন চিরকালের জন্য তাহারা যেরূপ নৃশংশভাবে বিদগ্ধ করিয়াছে, আমার পুত্রের প্রতি অবহেলাপূর্ণ ব্যবহারে যেরূপে বাধ্য করিয়াছে, নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির প্রায় পরক্ষণ হইতেই আমার উপর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, যে সব রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে—তাহা মনে হওয়ায় আমার আত্মগ্লানি ভস্মীভূত করিয়া প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। আমার মত স্বামী যে রাস্তায় গড়াগড়ি যায়, তাহা ভালরূপে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইবার দৃঢ় প্রবৃত্তি হইল। আমি স্ত্রীপুত্রের নামে শপথ করিলাম—যতক্ষণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ না হয়, ততক্ষণ এ বিষময় জীবন ধারণ করিব। সঙ্কল্প স্থির করিয়া তখনই উঠিলাম। বাটী অভিমুখে চলিলাম। রাস্তায় দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম, সে কুক্কুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কি না। আমি সেইরূপ আকৃতির ব্যক্তি সকলের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলাম। আমার দৃষ্টি উন্মাদের ন্যায় হইয়া থাকিবে, কারণ আমাকে দেখিয়া লোকে তফাতে যাইতেছিল। এইরূপ দেখিতে দেখিতে বাসায় আসিলাম। তখন রাত্রি প্রায় বারটা হইয়াছে। আসিয়া দেখি মাতা ও কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া নিজেদের জিনিষপত্র লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে; আমি সেই ঘরে—যেখানে আমার সাক্ষাৎ নরককুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল—প্রবেশ করিলাম। মাথা ঘুরিয়া গেল, মেজের উপর বসিয়া পড়িলাম। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখি পুরাতন কাগজ, চিঠিপত্র ছড়ান রহিয়াছে। হঠাৎ একখানা চিঠির উপর দৃষ্টি পড়িল, লেখা রহিয়াছে "প্রিয়তমে হেনা"; চিঠি কুড়াইয়া লইলাম, পড়িয়া অনেক কথা জানিতে পারিলাম। ইদানীং মাতা কন্যার কলহের কারণ, কন্যার তাড়াতাড়ি বিবাহদান প্রভৃতি সমস্ত জটিল বিষয় একেবারে বিশদ হইয়া উঠিল। পত্রলেখক গোপাল সিংহ। পাপিষ্ঠ বরাবর মাতার প্রণয়াসক্ত ছিল, ইদানীং কন্যার উপর আসক্তি হইয়াছিল। পশু নিজ কন্যাস্থানীয়া মনোরমার নবযৌবনোন্মেষ দেখিয়া নারকীয় প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে পারে নাই। মা প্রথম হইতে এই প্রণয়ের আভাষ পাইয়াছিল, পরে কন্যার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, ইহারই জন্য এখন বুঝিলাম কেন আমার বিবাহ তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহারা আমাকে তাহাদের পাপের আবরক করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান হওয়ায় আলোড়িত মন কতকটা সুস্থির হইল। আমি সেইখানে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলাম ও ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখিলাম বেশ বেলা হইয়াছে; সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতর পড়িয়াছে—যেন তাহা পাপের প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছে। আমি দুই একখানা চিঠি পাইলাম, তাহাতে যাহা কিছু নামমাত্র সন্দেহ ছিল তাহা দূর হইল। পূর্ব্ব রাত্রের দৃশ্যাবলী ঘন ঘন মনে আসিল। আমার প্রবল চেষ্টা সত্বেও মন কেবল সেই দিকেই ধাবিত হইল। একে একে সমস্ত ঘটনা মনে আসিতে লাগিল—আবার প্রতিহিংসালিপ্সা ফিরিয়া আসিল। আমি সেই মুহূর্ত্তেই বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। সেই আমার গার্হস্থ্য-জীবনের শেষ অধ্যায়। তাহার পর হইতে আমি বন্য পশুর ন্যায় কলিকাতার এক বস্তী হইতে অন্য বস্তীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। কবে কোথায় ছিলাম কিছুই মনে নাই। কিরূপে দিন কাটিত তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। নানা প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনে আমি যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার চেষ্টা করিতাম। কখন সঙ্গীর ও সরঞ্জামের অভাব হইত না। দিবারাত্র লক্ষ্যহীন ভ্রমণে ও নানাপ্রকার ব্যক্তির সহিত মেশামিশি করিয়া আমার কলিকাতার সমাজের নানা স্তরের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা এই আমার বিষময় জীবনে অমৃত-বুদ্‌বুদ্‌ তুল্য। এই কলিকাতা মহানগরী পাপের একটি বিশাল কারখানা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে ছোট, বড়, নানা প্রকারের পাপ প্রত্যেক ঘণ্টায় শত শত সংখ্যায় সংঘটিত হইতেছে।

এখানে নানা শ্রেণীর চোর, জুয়াচোর. বিষপ্রয়োগকারী, খুনে, ডাকাত, নোট জালিয়াৎ, গাড়ীমারা, থানকীদার, 'ছুকরী'বিক্রেতা, 'ছুকরী'পালক, কোকেন ও নানা প্রকার আবগারীর অবৈধবিক্রেতা এবং নানাপ্রকার জুয়াচোর দলের অভাব নাই। প্রত্যেক দলের অস্তিত্বের বিষয় পুলিশ অবগত আছে এবং তাহাদের কার্য্যকলাপের বিষয় তাহারা যে অনভিজ্ঞ তাহাও নয়। অনেক দলকে নিজেদের সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য মাসে মাসে অনেক ব্যয় করিতে হয় কখন কখন নূতনের সহিত কার্য্যের বড় অসুবিধা হয়। কিন্তু প্রায়ই এক প্রকার বন্দোবস্ত হইয়া যায়। এখানে বেশ্যার বাড়ীতে সর্ব্বোচ্চস্তরের ভদ্রলোক নিম্নতমস্তরের বদমায়েসের সহিত এক সঙ্গে মদ খাইতে দেখিয়াছি; মটরগাড়ীওয়ালা লক্ষপতি চোরের সর্দ্দারের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিয়াছি; উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী রাত্রে খোলার বাটীতে 'ছুকরী'র অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। এখানে অর্থ একটী প্রধান আদরের জিনিষ। অর্থ থাকিলে পুরাতন চোরের সর্দ্দারও ভদ্রপল্লীর সর্দ্দার হইতে পারে; সোণাগাছির বেশ্যা পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা হইয়া পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া খাইতে পারে; কিস্তিওয়ালা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে। অর্থ থাকিলে কোন অপরাধের সাজা হইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। বস্তীতে বস্তীতে টপ্‌কাওয়ালা, গাড়ীমারা, নাবালিকা-ব্যবসায়ী, জালিয়াৎ, কোকেনওয়ালার দল বিরাজ করিতেছে ও আপন আপন কার্য্য নিয়মিতরূপে চালাইয়া দিনপাত করিতেছে, যেন তাহাদের কথা বলিবার কেহ নাই। প্রতিদিন অবৈধ উপায়ে হাজার হাজার টাকার আবগারী বিক্রয় হইতেছে; বেশ্যাপল্লীতে নিঃসহায় দুগ্ধপোষ্য বালিকা ক্রীত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি জন্য পালিত

হইতেছে ও শত শত বয়স্থা কন্যা বৃদ্ধা পিশাচিনীদের অধীনে ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে; প্রতি রাত্রে কত গাঁটচোর পুলিশের ঘাঁটির পাহারার কাছেই দলবদ্ধ হইয়া চুরির মন্ত্রণা ও চুরি করিতেছে; সহরের বড় রাস্তায় কত রাহাজানি, হত্যাকাণ্ড হইতেছে; কত জুয়াড়ী ( den-keeper ) জুয়াখেলা হইতে এক রাত্রে শত শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে; কত জুয়াচোরের দল মিথ্যা দোকান, গদি, আপিস করিয়া বসিয়া আছে; কত গুণ্ডা ও জুয়াচোর সরকারী বাগানে শিকারের চেষ্টায় ফিরিতেছে; কত বদমায়েসের দল বিষ লইয়া বেশ্যা বাটীতে ঘুরিতেছে! এই সকল বিষয় যে কর্ত্তৃপক্ষের একেবারে অবিদিত আছে তাহা নহে। প্রত্যেক দলেরই এক এক নির্ব্বাচিত কার্য্যপ্রণালী আছে, উহা দেখিয়া কোন্ অপরাধ কোন্ দলের কার্য্য তাহা নির্ণয় করা দুরূহ নহে। অথচ প্রত্যেক দলই নির্ব্বিবাদে কিম্বা অতি অল্প আয়াসেই বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। তাহাদের নিঃশেষ করিবার লোক কিম্বা চেষ্টা নাই। সততা ও সতর্কতা অবলম্বন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের একেবারে বিতাড়িত করা যাইতে পারে। ধরা পড়িলে বদমায়েসগণের বিচার ও সাজা হয় সত্য, কিন্তু তাহাদের নেতাগণের গাত্রে প্রায়ই আঁচ লাগে না। কলিকাতায় পাপক্রিয়ার এইরূপ সুবিধা থাকাতে অন্যত্র হইতে পাপিষ্ঠেরা যে এই সহরে আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই।

প্রতিদিন এখানে যে শুধু বাহির হইতে পাপাচারীর আমদানি হইতেছে তাহা নহে, এখানে পাকা বদমায়েস ( vetern criminals ) দ্বারা অনেক বালক পাপ কার্য্যের জন্য রীতিমত পালিত হয়। কলিকাতায় এমন শত শত নাবালক ও নাবালিকা আছে,

যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কোন লোক নাই! হয়ত তাহাদের পিতামাতা মরিয়া গিয়াছে কিম্বা অভাববশতঃ তাহাদের পরিত্যাগ করিয়াছে। কলিকাতায় বদমায়েসেরা ও বেশ্যারা এই সকল বালক-বালিকাদিগকে সংগ্রহ করে ও তাহাদিগকে পাপ কার্য্য শিক্ষা দেয়। অনেক পিতামাতা অভাববশতঃ নিজ সন্তানদিগকে বিক্রয় করে। আবার অনেকে সমাজে মুখরক্ষা করিবার জন্য নিজেদের পাপের ফলকে হস্তান্তরিত করে। এ সকল সন্তান প্রায়ই দুরাচার-দিগের হস্তে পতিত হয়। বালক হইলে তাহাদিগকে অল্প বয়স হইতেই কোকেন ও সুরাপানে অভ্যস্ত করা ও চুরি করিতে এবং পকেট মারিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিয়ৎদিন চুরি করিয়া আনিতে না পারিলে তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করে এবং আহার ও কোকেন ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেয়, কাজে কাজেই তাহারা প্রাণের দায়ে চুরি করিতে বাধ্য হয়। ধরা পড়িলে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে তাহাদিগকে জামিন, মোচলকা দিয়া ছাড়াইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হয়। পুরাতন বদমায়েস দিগের অধীনে এইরূপ অনেক পাঁচ হইতে বিশ বৎসর বয়স্ক বালক-চোর আছে। বড় হইলে তাহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকে ও ভীষণ গুণ্ডায় পরিণত হয়। আবার একদল বদমায়েস আছে, যাহারা পার্ক, একজিবিশন, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদস্থলে ঘুরিয়া বেড়ায় ও অভিভাবকশূন্য ভদ্রলোকের ছেলেদের সহিত আলাপ করে। নিজ ব্যয়ে দুই চারি দিন তাহাদিগকে থিয়েটার, বেশ্যালয় প্রভৃতি স্থানে লইয়া যায় ও তাহাদের মতিগতি খারাপ করে। পরে বাটী হইতে গহনা ইত্যাদি চুরি করিতে পরামর্শ দেয়। এই সকল ভদ্র সন্তান বদমায়েসদিগের হস্তে পতিত হইয়া পাপাচারে প্রবর্ত্তিত হয়।

বালিকাদিগকে যেরূপে পাপ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা হয় সে আরও ভয়াবহ! যৌবনে পদার্পণ করিবার অগ্রেই অনেক ঘৃণিত নিষ্ঠুর, কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়! তাহাদের দ্বারা প্রত্যেক রাত্রে যত বেশী সম্ভব উপার্জ্জন করান হয়! এমন দেখা গিয়াছে যে এক একজন নাবালিকাকে এক রাত্রে আটজন পর্য্যন্ত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে! অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, এই সব মানবীরূপধারিণী রাক্ষসীরা তাহাদের অশেষ প্রকারে শাস্তি দিতে দ্বিধা করে না। অনেক সময় হতভাগিনী বালিকাদিগকে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে হয়! কোন কোন হতভাগিনী অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিকৃতমস্তিষ্কা হইয়া গিয়াছে; অনেকে আত্মহত্যা করিয়া সব জ্বালা জুড়াইয়াছে; অনেক বালিকা জঘন্য সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া চিরকালের জন্য পঙ্গু হইয়াছে! কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে অনেকে এই সকল অত্যাচার সহ্য করে না; তখন তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দূরীভূত করা হয়। তখন তাহারা বাধ্য হইয়া কাবুলীর ও কিস্তীওয়ালার আশ্রয় লয় ও সমস্ত জীবন সকল রকম শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়! কলিকাতায় এত সমাজ-সংস্কারক আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের চক্ষের উপর বালকবালিকাদিগের এরূপ দুর্গতি হইতেছে দেখিয়াও তাঁহাদের চিত্ত ইহার প্রতীকার করিবার জন্য আদৌ আকৃষ্ট হয় না! সমাজের উপর এই সকল পাপের বিষময় ফল দেখিয়াও কাহারও চৈতন্য হইতেছে না! এই যে কলিকাতা ঘোর গুণ্ডামীর রাজত্বে পরিণত হইয়াছে, ঘৃণিত

দুর্নীতির নরক-হ্রদ হইয়াছে, ইহার মূলে এই মহানগরীর বালক-বালিকার উপর তত্ত্বাবধানের অভাব ব্যতীত আর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কলিকাতার নানা স্থানে আমার স্ত্রীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি। তাহাদের অন্বেষণই আমার লক্ষ্য ছিল, অন্য বিষয়ে একপ্রকার অন্ধ ছিলাম; তথাপি আমি চক্ষের সামনে যে সকল পাপক্রীড়া দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা করিলে পল্লীবাসী সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না! কলিকাতায় পাশ্চাত্য দেশীয় পাপে পূর্ণ হইয়াছে। অর্থের জন্য এখানে করিতেছে না, এমন পাপ খুবই কম আছে! স্বামী স্ত্রীকে, পিতা কন্যাকে বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে! বাহিরে ভদ্রলোকের মত থাকিবার—বেশভূষা, আহার, বিহার করিবার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক অতি ঘৃণিত অভদ্র উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে না! তাহাদের দিনরাত ভাবনা কিরূপে আধুনিক ভদ্রলোকের standard মত সংসার চালাইতে পারিবে, কিন্তু নিজেদের আয়ে কিছুতেই কুলাইতে পারিতেছে না! ফলতঃ তাহারা প্রথম প্রথম গোপনে পাপ করিতে আরম্ভ করিয়া, পরে ক্রমশঃ 'নামকাটা সিপাইয়ের' মধ্যে পরিগণিত হইতেছে!

আমাকে দুই একবার কোর্টে যাইতে হইয়াছে, সেখানে অপরাধীর মধ্যে ভদ্রলোকের ঘরের ছেলের সংখ্যা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম! তাহারা সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা অধিক কৌশলী, ভীষণ ও নৃশংস! তাহাদের মধ্যে অনেককেই চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডনীয় হইতে দেখিয়াছি! চুরি,

ডাকাতির জন্য তাহারা কথায় কথায় ছুরি ছোরা চালাইতে ও খুন করিতে প্রস্তুত; বর্ত্তমান উপায়ে তালা ভাঙ্গিতে, অর্গল খুলিতে, সিন্ধুক ভাঙ্গিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত; তাহারা দিন দিন চুরি ডাকাতি করিবার কত নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে; পাশ্চাত্য দেশের অনেক পন্থা এই দেশে চালাইতেছে! তাহারা দল পাকাইতে খুব মজবুত! অনেক ভদ্র সন্তান কাজ কর্ম্মের অভাবে এবং ভদ্র উপায়ে সংসার চালাইবার অক্ষমতা প্রযুক্ত তাহাদের দলে যোগদান দিতেছে! তাহারা অবিবেচক-সমাজের শত্রু বলিয়া স্পর্দ্ধাসহ নিজেদের পরিচয় দেয়। তাহাদের ও অপরাধী মাত্রেরই উন্নতি-সাধন কিম্বা উন্মূলন, সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাড়াইয়াছে!

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সেই কালরাত্রির অবসানের পর মনোরমার গৃহ হইতে যে বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন হইতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কোথায়, কবে, কিভাবে কাটিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক মনে নাই। দিনরাত্র মাদক সেবনে অভিভূত হইয়া আমি পশুর ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। প্রতিহিংসা-সাধন ব্যতীত জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা না থাকিলে, আমি এতদিন নিজ জীবন নষ্ট করিতাম। অনেক সময় তাহা মনেও আসিয়াছে এবং আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিষ পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু অচরিতার্থ প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে!

জীবনের এই অংশ হইতে আমার বেশ জ্ঞান হইয়াছে, যে পশুর ন্যায় জীবনধারণ করিলে জীবন-নির্ব্বাহ পশুর জীবনধারণের ন্যায় সুলভ ও সহজ হইয়া পড়ে! আমার আহার, নেশা, থাকিবার জায়গা, কোথা হইতে জুটিয়া যাইত, তাহা আমি বলিতে পারি না! পাপ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস অতি সহজ পদার্থ। আমি কত বস্তীতে কত রকম লোকের সহিত মিশিয়াছি; কত কোকেন-খানা, চণ্ডুখানায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; কত চোর, বদমায়েসকে খুন, চুরির পরামর্শ করিতে শুনিয়াছি—তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে পারা যায় না। আমার মনে হয় কলিকাতার বস্তী-জীবনই কলিকাতার পাপকে জাগাইয়া রাখিয়াছে! দরিদ্র কারিকর, মুটে মজুর, সামান্য ব্যবসাদার ও চাকুরে, পিয়ন, চাপরাশি প্রভৃতিকে

বাধ্য হইয়া কখন একা, কখন সপরিবারে এক এক প্রকাণ্ড বস্তির মধ্যে দুই একখানা খোলার ঘর লইয়া থাকিতে হয়। তাহাদের পার্শ্বের ঘরেই, হয়ত, কোকেন কিম্বা চণ্ডুর আড্ডা চলিতেছে, কিম্বা কেহ বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে, কিম্বা চোর বদমায়েস জমায়েত হইয়া চুরি ডাকাতির পরামর্শ করিতেছে, কি চোরাই মালের কারবার করিতেছে—ইহা তাহাদের অবিদিত থাকে না। ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংস্পর্শে তাহাদের পুত্র কন্যা দূষিত পন্থা অবলম্বন করে! অনেক সময় নিজেরাই পাপ কার্য্যের লোভ সংবরণ করিতে পারে না। এইরূপে কলিকাতায় পাপ হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক বৃদ্ধিই পাইতেছে।

এই বস্তি হইতেই পুরাণ পাপীরা তাহাদের সাকরেদ্ সকল সংগ্রহ করে। প্রত্যেক বস্তিতেই এমন অনেক বালক বালিকা আছে, যাহাদের তত্বাবধান করিবার কেহই নাই। কেহ বা পিতৃমাতৃহীন; কাহার, হয়ত, পিতামাতা তাহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; কাহারও পিতামাতা অর্থাভাববশতঃ তাহাদের ভরণপোষণ করিতে পারে না। এই সকল বালক বালিকাদিগকে একমুঠা খাইতে দিয়া পুরাণ বদমায়েসেরা পাপ কার্য্যে দীক্ষিত করে। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে ছোট ছোট পাপ করিতে শিক্ষা দেয়। কখন ধরা পড়িলে তাহাদের ছাড়াইবার চেষ্টা করে। প্রথম হইতে তাহাদের কোকেনে অভ্যস্ত করে,—উদ্দেশ্য এই যে তাহারা কখন পাপ পথ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এইরূপ হতভাগ্য বালক প্রত্যেক বিড়িওয়ালা, কোকেনওয়ালা, পুরাণ চোরের কাছে পাঁচ দশ জন করিয়া প্রতিপালিত হয়। তাহারা বড় হইয়া নিজে নিজে কার্য্য আরম্ভ করে ও সমাজের ভীষণ শত্রুরূপে পরিণত হয়। আমি

এইরূপ অভিভাবকহীন বালকদিগকে কোকেনওয়ালার নিকট প্রতিপালিত হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দুই একদিন চুরি করিয়া আসিতে না পারিলে তাহাদিগের আহার ও কোকেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও ভীষণ প্রহার করা হয়; অগত্যা প্রাণের দায়ে চুরি করিতে হয়! এই সকল কোকেনওয়ালা তাহাদের ব্যবসা নির্ব্বিঘ্নে চালাইতেছে! তাহাদের ধরা পড়িবার কিম্বা দণ্ড পাইবার কোন ভয় নাই! আমি এক কোকেনওয়ালার হিসাব বহিতে প্রতিমাসে 'মহাবীরের পূজা' বলিয়া ৫০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ লেখা আছে দেখিয়াছি! কোকেনওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে হাসিয়া বলিল, "বাবুজি! কলিকালের মহাবীরজীকে কে না জানে?" আমি তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, কলিকাতায় কেন যে কোকেন-ব্যবসায় বন্ধ হয় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

বিকৃত মস্তিষ্ক, মাদক-সেবনে আরও বিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিল ও তৎসঙ্গে প্রতিহিংসানল নিস্তেজ না হইয়া আরও প্রবলরূপ ধারণ করিল। এক এক সময় জিঘাংসার তাড়নায় আমি নিজের হাত পা কামড়াইয়া নিজেকে ক্লেশ দিতাম! কত সময় কল্পনায় আমার মানব-শিকারদিগকে মনে মনে হত্যা করিয়া আনন্দ ভোগ করিতাম! আমি নাকি কত সময় সহজ অবস্থায় প্রলাপ বকিতাম! কেহ কেহ আমাকে উন্মাদ মনে করিত, কেহ বা আধ-পাগলা বলিত! অনেক সময়ে আমার সর্ব্বনাশ-সাধকদিগকে হাতে পাইলে, কিরূপ নৃশংসভাবে তাহাদিগকে হত্যা করিব, তাহার কল্পনা লইয়া মস্তিষ্ক দিনরাত ব্যস্ত থাকিত। আমি এক জায়গায় স্থির থাকিতে পারিতাম না। দুই দিন এখানে, দুই দিন ওখানে এইরূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কত রাত পার্কে, ফুটপাতে,

সুঁড়ীখানায় বা রাস্তায় অতিবাহিত হইয়াছে! আমার খুব আপনার লোক আমাকে দেখিলে চিনিতে পারিত না! অচেনা লোক আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া সরিয়া যাইত! আমি একদিন পান-ওয়ালার দোকানে আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া বনবাসী নরখাদকের মুখ মনে করিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলাম!

প্রায়ই পুত্রের কথা, কখন কখন স্ত্রীর কথা মনে পড়িত। তাহাদের উপর অত্যাচারের কতক শাস্তি ভোগ করিতেছি, মনে করিয়া অন্তরাত্মায় শান্তি পাইতাম! আমার মনে হইত হারু আমাকে ভুলিতে পারে নাই! তাহার মার কাছে যাইয়াও, তাহার অধম পিতার জন্য কখন কখন ভাবিত হয়! কবে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে, এই ভাবনায় ব্যস্ত থাকিতাম। এমন স্নেহময় পুত্র কাহারও কি হয়! আমি কখনও তাহাকে ভাল খাওয়াইতে পারি নাই, পরাইতে পারি নাই, অথচ আমার উপর এত মমতা! আর তাহার মা—কি সরল সতীত্বের আদর্শ! কি নির্ব্বাক গভীর প্রেম! কি আড়ম্বরহীন কর্ত্তব্যপালন! আমি মানুষ হইলে, বিচারের ক্ষমতা থাকিলে, আজ আমার এ দশা হইবে কেন? কি 'সোনার বাগানে' আগুন লাগাইয়া আমি দুর্গন্ধ পঙ্কিল কুণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলাম!

কলিকাতায় শিকারের তল্লাসে যখন হতোদ্যম হইতাম, তখন আর কলিকাতায় আবদ্ধ থাকিতে ভাল লাগিত না। কখনও ঝোঁকের মাথায় এধার ওধার চলিয়া যাইতাম। একদিন এইরূপ ঝোঁকের বশে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাই। বহুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও উদ্যান প্রথম দর্শনের স্মৃতি মনে আজও জাগরূক রহিয়াছে! সেই নিবিড় স্নিগ্ধ পবিত্র বটচ্ছায়া, সূর্য্য-করোজ্জ্বল মৃদুবাহী জাহ্নবী-বারির সেই চিত্তাকর্ষক কলনাদ, উন্নত মন্দিরগণের

সেই সৌম্যভাব আমার হৃদয়-মরুতে কি অনির্ব্বচনীয় শান্তির ধারাই প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল! আমার দগ্ধ জ্বালাময় চিত্তে, অনেক দিন সেরূপ বিরাম অনুভব করি নাই! ক্ষণেকের জন্য আমার বাল্যকালের মানসিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল! মনে হইয়াছিল, মানুষ কেনই বা পাপ করে! পাপ করা কত অস্বাভাবিক! মার্জ্জনা কত সহজ! প্রতিহিংসা-সাধন কি ঘৃণিত কার্য্য! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্তিবশতঃ শীতলবায়ুর ব্যজনে কোমলছায়ার ক্রোড়ে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন জাগিয়া উঠি, তখন মনে বিস্ময় আসিয়া উপস্থিত হইল। একি! আমি কি এক নবজীবন লাভ করিয়াছি! আমার জীবনের লিপিকা হইতে যন্ত্রণাদায়ক কয়েক পংক্তি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে! পুনরায় আমি নূতন করিয়া পুরাণ সংসার পাতিতে পারিব! ক্রমে ক্রমে আমার সঠিক অবস্থা উপলব্ধি হইল! সম্মুখের শ্যামসুন্দর দৃশ্য, সব মুছিয়া গেল! হায়! দক্ষিণেশ্বরের সেই স্নিগ্ধ অনুভূতি আমার মনে যদি স্থায়ী হইত! যদি আমার মন হইতে সেই আনন্দদায়ক সৌম্যভাব না ঘুচিয়া যাইত! তখন কে জানিত, এই দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র পদপ্রান্তে আমার দ্বারা মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত জঘন্য পাপ—হত্যাকার্য্য—সংসাধিত হইবে! কে জানিত এই জাহ্নবীদেবী, যিনি একদিন স্নেহময়ী মাতার ন্যায় স্বর্গ-ধ্বনিতে আমাকে শান্তির আবরণে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই পূত অঞ্চলপ্রান্তে, তাঁহারই স্নেহ-চক্ষের তলে, আমার দ্বারা নিজ নর-জীবনে পশুত্বের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইবে!

বর্ষাকাল—তিন চার দিন ধরিয়া প্রায়ই চব্বিশ ঘণ্টাই বৃষ্টি হইতেছে; বেশ বাদলা; পথে ঘাটে লোক প্রায়ই বাহির হয় না।

আমি দুই তিন দিন অর্দ্ধানশনে কাটাইয়াছি! খাইবার ঠিকানা নাই, ইচ্ছাও নাই, কেবল নানাপ্রকার মাদকদ্রব্য-সেবনে মস্তিষ্কের উচ্চণ্ডতা বৃদ্ধি পাইতেছে! আমি ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উঠিয়াছি। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, জোরে বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার রক্তিমবারি ভীমবেগে বহিয়া যাইতেছে; সন্ধ্যা হইতে ঘণ্টাখানেক দেরী থাকিলেও সন্ধ্যার প্রাক্কালের ন্যায় দেখাইতেছে। আমি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরঘাটের সম্মুখে যাত্রীদের আশ্রয় স্থানে বসিয়া আছি, কাছে জনমানব নাই, মনে লেশ মাত্র শান্তি নাই। ক্ষিপ্ততার প্রথম অবস্থায় পৌঁছিয়াছি। দেহে, প্রাণে যেন কে সর্ব্বদা অগ্নিধারা ঢালিয়া দিতেছে! অল্পক্ষণও মন কোন বিষয়ে স্থির করিবার ক্ষমতা নাই, পৃথিবীর সর্ব্বালোক ও সকল দ্রব্যকে নিজের শত্রু বলিয়া মনে হইতেছে! কি করি,—কিরূপে এ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাই—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে কি এক ভয়ানক বেদনা হইতেছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধিও করিতে পারিতেছি না! যতই তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছি, ততই বাড়িয়া যাইতেছে! বসিয়া, শুইয়া, কিছুতেই স্বস্তি নাই। এরূপ জ্বালার মূলীভূত কারণ স্মরণ করিয়া মনে হইতেছে যে তাহাদের এখন একবার দেখা পাইলে বন্য পশুর ন্যায় চিবাইয়া খাই! যন্ত্রণার তাড়নায় সেইখানে দ্রুত পদচারণ করিতেছি। এমন সময় দেখিলাম একখানা নৌকা ঘাটে আসিয়া থামিল। এই নির্জ্জনতার মধ্যে আমার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। নৌকা হইতে একজন স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ নামিল। মাঝিকে পয়সা দিয়া তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে আরম্ভ করিল। আমি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। এ

কি দেখিলাম! এ যে মনোরমার মত হাটুনি! ও কে, গোপাল সিংহ নয় ত? সেইরূপ ত খাকি সার্ট পরা, সেইরূপ গোঁপ। আমি একটু অগ্রসর হইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। হাঁ, এ ত তারাই! সেই পাপীয়সী মনোরমা ও তাহার প্রেমিক পাপিষ্ঠ গোপাল সিংহ! আমার আর চিন্তা করিবার অবকাশ নাই, দ্রুত যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "কি গোপাল সিংহ যে!" সে ত্রস্ত হইয়া মনোরমার হাত ছাড়িয়া দিল। মনোরমা ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে দূরে চলিয়া গেল। আমি প্রচণ্ড স্বরে বলিয়া উঠিলাম, "অনেক দিন পরে তোমাকে পাইয়াছি!" গোপাল ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, "না মশায়, মাপ করবেন; আমি কিছুই জানি না" এই বলিয়া দুই হস্তে আমার ডান হাত ধরিল। আমি বলিলাম, "তোমায় ভাল করে মাপ করছি"; বলিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া দুই হস্তে গলা টিপিয়া ধরিলাম। আমি তাহার চেয়ে খুব বেশী সবল না হইলেও, সে চেষ্টা করিয়াও আমার হাত ছাড়াইতে পারিল না। তখন আমার দেহে অসুরের বল আসিয়াছে! গলা হইতে আমার হাত ছাড়াইতে না পারিয়া, ঝটাপটি করিতে করিতে সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল। আমি বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া গলা আরও চাপিয়া ধরিলাম! তাহার চক্ষু কপালে উঠিল! আমার হাতের উপর তাহার হাতের জোর শিথিল হইয়া আসিল! আমি বুঝিলাম কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে! নিমেষের মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল! রক্তস্বাদে শার্দ্দূলের মত তখন আমি উন্মত্ত! তাহাকে ছাড়িয়া মনোরমার অন্বেষণে উপরে উঠিলাম! এদিক ওদিক দেখিলাম, তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শবের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম তাহা একদৃষ্টে যেন আমার দিকে

চাহিয়া আছে! মৃতের সে কি অদ্ভুত দৃষ্টি! যেন সম্মুখে হঠাৎ এক অদ্ভুত বস্তু দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত তাহা দেখিতেছে! আমার সে চাহনি চিরকাল মনে থাকিবে! আমার মনে ভয় হইল; আমি তাহাকে সেখানে ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী অন্ধকার বনের মধ্যে লুকাইলাম। তথায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিলাম।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া দুই তিন দিন লুকাইয়া রহিলাম। সর্ব্বদা ভয়, পুলিশে কখন গ্রেপ্তার করে। তৃতীয় দিনে এক দৈনিক পত্রে পড়িলাম, আহিরীটোলা ঘাটে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোকের শব পাওয়া গিয়াছে। লাস্ অত্যন্ত গলিত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় সনাক্ত হওয়া দুরূহ, পুলিশ তদন্ত করিতেছে। পুরুষের পরিধানে যে বস্ত্রের উল্লেখ ছিল, তাহাতে তাহাকে গোপাল সিংহ বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এ স্ত্রীলোক কে? একি অন্য কোন স্ত্রীলোক, না মনোরমা? আর মনোরমারই বা লাস্ হইবে কি করিয়া? সে কি আত্মহত্যা করিয়াছে, না পরে, যখন গোপালের মৃতদেহের নিকট আসিয়া থাকিবে, তখন জলের টানে ভাসিয়া গিয়াছে! আমার মনে হইল সেদিন জোয়ারের টানের বড় জোর ছিল ও শবও জলের খুব নিকটে পড়িয়াছিল। তখন জোয়ার সবে আরম্ভ হইয়াছিল, হয়ত কিছু পরে মনোরমা ও শব উভয়ে টানে ভাসিয়া যাইয়া থাকিবে!

মন বড় উদ্বিগ্ন হইল, আমি ভাবিলাম যাহাই হউক প্রকৃত তথ্য জানিতে হইবে। এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা অপেক্ষা ক্লেশকর আর কিছুই নাই! আমি গ্রেপ্তারের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া শব-ব্যবচ্ছেদাগারে যাইবার মতলব করিলাম। সেখানে যাইয়া ডোমেদের নিকট শুনিলাম সেইদিন প্রাতে এক স্ত্রী ও পুরুষের শব ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে; শব তখনও দাহঘাটে লইয়া যাওয়া হয় নাই। তাহাদের

কিছু পয়সা দিয়া শব দেখিতে চাহিলাম। শব দেখিয়া আমি অতর্কিতে চীৎকার করিয়া ফেলিলাম! এ ত মনোরমা ও গোপাল সিংহের মৃতদেহ! দুই শব এক জায়গায় রহিয়াছে! সেদিন রাত্রে তাহাদের যে আলিঙ্গনবদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তাহারা কতক সেইরূপ অবস্থায় রহিয়াছে! হতভাগিনী ও হতভাগাকে দেখিয়া অজ্ঞাতে চক্ষে জল আসিল! ওঃ! কি ভীষণ পরিণাম! হায়! যদি তাহাদের সহিত জীবনে সাক্ষাৎকার না হইত, তাহা হইলে আমাকে এ পাপের জন্য দায়ী হইতে হইত না! এতদিন যাহাদের হত্যা কামনা করিয়া আসিতেছিলাম, হত্যার পর তাহাদের জন্য প্রাণে ব্যথা হইল! নৈতিক জমাখরচের খাতায় এতদিন আমার তাহাদের নিকট অনেক পাওনা ছিল! তাহার আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা ছিল না! এখন আমি তাহাদের নিকট সুদশুদ্ধ সব আদায় করিয়াছি ও অনেক বেশী লইয়া ফেলিয়াছি! এখন আমি তাহাদের নিকট দেনদার! এত অধিক আদায় করা আমার ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ কোন অধিকার ছিল না! জীবন-বলিতে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়ায়, এখন তাহারা পাপমুক্ত! এখন আমিই এই ভয়াবহ অভিনয়ের মধ্যে একমাত্র পাপী! আমার মনে হইতে লাগিল, যাহা ঘটিয়াছে তাহা শুধু আমারই দোষে, আর কাহারও কোন দোষ নাই! মনোরমা, গোপাল, মনোরমার মা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী! আমি কেন না বিচার করিয়া অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করিতে যাইলাম! মনোরমার অপরাধকে এতদিন যেরূপ জঘন্য বলিয়া ভাবিতাম, এখন তাহা মনে হইল না! প্রাণ অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। এবার ভাবিলাম সমস্ত সত্য প্রকাশ করিয়া নিজ অপরাধের দণ্ড

লইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি। কিন্তু নৈতিক ভরসায় কুলাইল না! আর হৃদয়ের যদি অত শক্তিই থাকিবে তবে আজ আমার এ দুর্দ্দশা কেন? যত কষ্ট, যত অপমান, যত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি সব কি মানসিক দৃঢ়তার অভাবের জন্য নয়? যদি মন দুর্ব্বল না হইবে তবে আমি অত শীঘ্র ফাঁদে পড়িব কেন? ফাঁদ যে শুধু আমার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা নয়, আমি ফাঁদে পড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম!

ডোমেদের নিকট শুনিলাম তাহারা বৈকালে শব দাহস্থানে লইয়া যাইবে, পরদিন করোনারের নিকট মৃত্যুপরীক্ষা ( inquest ) হইবে। আমি বৈকালে দাহস্থানে যাইলাম, দেখিলাম বেওয়ারিশ শব স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে! কাহারও হাত নাই, কাহারও পা নাই, কাহারও মস্তকের কতক স্থান উড়িয়া গিয়াছে! সকলেরই নানা স্থানে চেরা! কি বীভৎস দৃশ্য! দেখিলে মানবদেহের নশ্বরতা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হয়! এই দেহের জন্য সারাদিন এত যত্ন, এত কেরামতি! মুখে একটী সামান্য ব্রণ হইলে পাছে তাহাতে খারাপ দেখায় সেই জন্য তাহা দূর করিবার জন্য কত চেষ্টা! নখের কণে একটু সামান্য বেদনা হইলে, তাহার যতক্ষণ না শান্তি হয় ততক্ষণ কি উদ্বিগ্নতা! কিসে ভাল দেখাইবে, এই জন্য কত আয়োজন, কত বেশভূষা, কত আয়াস! আর এখানে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে এত বৎসরের যত্ন, পরিশ্রম সব ভস্মীভূত হয়! আমি শবসকল দাহ হইতেছে দেখিলাম; মনে হইল যেন মানবপ্রকৃতির তমগুণের ফলাফল স্তূপীকৃত হইয়া বিধাতার আজ্ঞায় ভস্মীভূত হইতেছে!

আমি আমার শিকারদের শেষক্রিয়া সমাপন করিতে পারিয়া মনে মনে যেন কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলাম!

ফিরিবার সময় এক ঔষধালয় হইতে হাইড্রোসিনিক এসিড ( hydrocynic acid ) ক্রয় করিয়া বাসায় আসিলাম। অনেকের কাছে শুনিয়াছি ও অনেক স্থলে পড়িয়াছি, দুর্ভাগার এমন প্রকৃত বন্ধু ইহজগতে আর নাই! প্রয়োজন হইলে ইহার নিকট হইতে উপকারলাভে কেহ বঞ্চিত হয় না! দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবের আরও অনেক বন্ধু আছে বটে, কিন্তু জীবনভার লাঘব কার্য্যে, নিশ্চয়তায় ও ক্ষিপ্রহস্ততায়, উহার নিকট কেহই সমকক্ষ নয়! ইহা কখনও অকৃতজ্ঞের কিম্বা দুর্ব্বলের ন্যায় কার্য্য করে না! এই পরম বন্ধুর সান্নিধ্য পাইয়া আমি প্রাণে কতক বল পাইলাম! জানিলাম প্রয়োজন হইলে আহ্বান মাত্রেই আমার সাহায্যে উপনীত হইবে! মনে হইল ইহার সাহায্য এখন লইবার প্রয়োজন নাই। কল্য করোনারের ইন্‌কোয়েষ্ট হইবে, তাহারই বা কি ফলাফল হয়, দেখিবার জন্য মন উৎসুক রহিল।

সেদিন রাত্রে বেশ ঘুম হইল; এরূপ ঘুম বুঝি অনেক দিন হয় নাই! জীবনের ধারা একেবারে নিরূপিত হওয়ায় মন লাঘব হইল! এতদিন অনেকের কাছে দেনাও ছিল, পাওনাও ছিল। দেনা-পাওনা ঠিক না হওয়ায় হিসাব শেষ হইতেছিল না, কেবল অবিশ্রান্ত অঙ্কপাতই চলিতেছিল! এখন দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা গেল, জগতে কাহারও কাছে আমার কিছু পাওনা নাই, শুধু নিজের কাছে বিস্তর দেনা আছে! অন্তরাত্মা বলিয়াছে, আমার প্রাণ উৎসর্গ করিলেই সব পাওনা 'শেষ' বলিয়া লিখিয়া দিবে! যখনই তাহা দিব তখনই সে লইতে প্রস্তুত, কাজেই আমার তাহাতে তত তাড়াতাড়ি নাই।

পরদিন বৈকালে Coroner Courtএ যাইলাম। আমার

বন্ধুকে ফেলিয়া যাই নাই। ঠিক করিয়াছিলাম, যদি পুলিশে গ্রেপ্তার করে, তখনই বন্ধুর আশ্রয় লইব। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি সেই অবস্থায়ও মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। যেমন করোনার, তেমনি জুরি, আর তেমনি বিচারপ্রণালী করোনারের! বেশ ও রক্ত-বর্ণ মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি এখানে তাহার দৈনিক কার্য্যাবসানে বৈকালিক বিশ্রামের ( recreation ) চূড়ান্ত সমাধা করিতে আসেন! জুরি মহাশয়েরা সমস্ত দিনের ক্লান্তি, চেয়ারে বসিয়া ও পাখার বাতাস খাইয়া দূর করেন! পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর এজাহার দিতে উঠিলেন—তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন ও যাহা ভবিষ্যতে দেখিবার ও শুনিবার আশা করেন, সব একসঙ্গে, একসুরে বলিয়া দিলেন! দুই একজন উকিলও দেখিলাম, তাহাদের কোন কথা কহিতে দেখিলাম না। শুধু খবরের কাগজের সংবাদদাতাদিগকে নিজ নিজ নাম বাহির করিতে অনুরোধ করিলেন ও তাহাদের নিজ নিজ মক্কেলদের নিকট হইতে দুই, এক টাকা দেওয়াইলেন। দুই একটী বাজে সাক্ষী হইবার পর, ম্যাজিষ্ট্রেট দুই এক লাইনে নিজ রায় লিখিলেন এবং অর্দ্ধস্পষ্টস্বরে জুরিদের তাহাতে সহি করিতে আজ্ঞা করিলেন। জুরিরা সামান্য বুঝিয়া ও অধিক না বুঝিয়াই তাহাতে সহি করিলেন। সে রায়ের ভাষা ও ভাব অদ্ভুত রকমের। এক কেসের রায় হইল, 'মৃতের কোন জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা, অপরাধজনক হত্যা দ্বারা মৃত্যু হইয়াছে।' এই মূল্যবান রায় পুলিশের সপক্ষে যাইলে ভাল, বিপক্ষে যাইলে পুলিশ নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দ্বিধা করে না। অথচ এত ব্যয়ে এই প্রহসন চালাইবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধগম্য হয় না!

দুই এক কেসের পর আমার মোকদ্দমার ডাক হইল। পুলিশ সার্জ্জেনের সাক্ষী ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের জবানবন্দীর পরই করোনার আত্মহত্যা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ও জুরিদেরও সেই মন্তব্য প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও তাহাই করিলেন! লাস্ যে অত্যধিক গলিত ( decomposed ) অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল সার্জ্জেন সাহেব তাহা স্বীকার করিলেন, অথচ নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করিলেন যে মৃতদেহের শরীরে কোন জখমের চিহ্ন না থাকায়, এ একটী আত্মহত্যার ব্যাপার ( case of suicide ) ছাড়া কিছুই নয়! সবজান্তা ইন্‌স্পেক্টর অধিকন্তু আরও বলিলেন যে স্ত্রীপুরুষে পরস্পর কলহ করিয়া উভয়েই আত্মহত্যা করিয়াছে! inquest শেষ হইল; ইন্‌স্পেক্টার প্রভুরও একটী জটিল বিষয়ের তদন্ত সমাধান হইল বলিয়া, নিজেও নিশ্চিন্ত হইলেন ও উপরওয়ালাদিগকে বার্ষিক রিপোর্ট লিখিবার সুবিধা করাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। এইরূপেই কলিকাতার অনেক ভীষণ অপরাধের তদন্ত সমাধান হয়! ইহাতে যে অপরাধীর ভরসা বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এক সপ্তাহ হইল coronerএর inquest শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আর জীবনের কোন উদ্দেশ্য কিম্বা লক্ষ্য নাই। দিবারাত্র মনের মধ্যে শুধু এক বিষয়েরই তোলাপাড়া—আমি কি ছিলাম ও কি হইয়াছি! কেন এরূপ হইল? কেন আমি নিজের যাহা কিছু ছিল তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম না? যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য দায়ী কে? শুধু আমি ও আমার ধীশক্তি ( will ), না তাহাতে অদৃষ্টের যোগ আছে? কত লোক ত আমার অপেক্ষা অবিবেচনার কার্য্য করিয়াও আমার ন্যায় ভীষণ ফলভোগ করে নাই! কার্য্য ও

তাহার ফলের সামঞ্জস্য কোথায়? যে সকল প্রশ্ন কেহই নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই,—অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, পুরুষকার,—সেই সকল বিষয় মীমাংসা করিতে যাইয়া আমার মস্তিষ্কের স্নায়ু দিনরাত ছিন্ন-ভিন্নহইয়াছে! আমি কি ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ করিতে পারিতাম? না, যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল মাত্র, কিম্বা ইহার জন্য কতক আমি ও কতক অন্য কোন মহান্ শক্তি দায়ী? এই সকল বিষয়ের আলোচনা লইয়া আমার দিনরাত কাটিয়া যায়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃথা আলোচনা করিয়া আবার ঠিক পূর্ব্বস্থলেই উপনীত হই! দিনরাত ঘুম নাই। কখন স্ত্রী, কখন পুত্র, কখন মনোরমার কথা মনে পড়িতেছে। তাহারা কোথায় বা কেমন অবস্থায় আছে? তাহাদের সঙ্গে আর কখন কি দেখা হইবে না? না,—তাহাদের সর্ব্বস্ব শ্মশানের অগ্নিতে শেষ হইয়া গিয়াছে! মনে করি, যদি কখন দেখা হয়, তাহা হইলে আবার নূতন করিয়া—ভাল করিয়া—সংসার পাতিব! আর এরূপ অসামঞ্জস্য হইতে দিব না! প্রকৃতই পাগল—আমার পাগলের ন্যায় অনেক খেয়াল মনে আসে! মনোরমাকে তাহার প্রিয়ের নিকট স্বেচ্ছায় যাইতে দিব—যে যেরূপ চায়, তাহাকে সেইরূপই করিতে দিব! পরের সন্তোষ-বিধান প্রথম লক্ষ্য করিয়া, নিজের তুষ্টি সাধন সর্ব্ব পিছনে রাখিব! পুরুষকার-অদৃষ্টবাদের কোন মীমাংসা না হইলেও আমার জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে নিজের সুখকে সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য করা জীবনে অশান্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ!

আমার বন্ধুকে আমি হারাইয়া ফেলি নাই! তাহাকে বক্ষে লইয়া আমি দুই তিন দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়াছিলাম!

ইচ্ছা ছিল, যেখানে আমার পশুত্বের শ্রেয়তম বিকাশ হইয়াছিল, সেইখানেই এই পশুপ্রাণ বলি দিই! কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করি নাই! শান্তির লীলাক্ষেত্রে—পবিত্রতার স্বর্গে—এ ঘৃণিত প্রাণকে বলি দিয়া কলুষিত করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি আমার উপযুক্ত শেষস্থান—কলিকাতার দুর্গন্ধময় নর্দ্দামায়!—যেখানে প্রাতঃকালে মৃত বিড়াল, কুক্কুর, ইন্দুর প্রভৃতি পড়িয়া থাকে, এই ঘৃণিত পাপ-পঙ্কিল নৃশংস জীবনের সেই যোগ্য পরিণামস্থল!

ইহা নিশ্চিত, যে আর অধিক দিন আমার বিষ-নিশ্বাসে বিশ্বের বায়ু কলুষিত করিব না! আমার পাপদেহ বহনে, পৃথিবীর পাপের ভার আর বাড়াইব না! আমার ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে! শুনিয়াছি, ভগবানের রাজ্যে সকল বস্তুরই প্রয়োজনীয়তা আছে! গিরিগহ্বরনিহিত অত্যুৎকট বিষচূর্ণও সময়ে সময়ে মানবের হিতকর হয়! দুর্গমারণ্যের তিক্তস্বাদ বিষলতাও কখন কখন ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সুফলদায়ক হয়! বন্য-হিংস্রক-পশুর অস্থিগত মজ্জাও মানবের উপকার সাধন করিয়া থাকে! আমার এই ঘৃণিত জীবনের দৃষ্টান্ত কাহারও কি কোন উপকারে আসিবে না? পাপানুষ্ঠানের অচির-প্রসূত ভীষণ ফললাভ কাহাকেও কি সাবধান করিয়া দিবে না? পরের প্রাণে আঘাত দিয়া নিজ সুখান্বেষণের ভীষণ পরিণাম, কাহাকেও কি অনুসৃত পাপ-পন্থা হইতে বিরত করিবে না?

সমাপ্ত।

# রাধা

শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য
( এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট )

প্রণীত।

সন ১৩৩৪ সাল।

প্রকাশক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য বি, এ,
সি, টী, এজেন্সী,
১, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা,
বাঁশরী প্রেস,
২৪৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

# আশা।

## প্রথম অধ্যায়।

---

বি, এ, পাশ করিয়া বঙ্কিম বিপত্নীক হন। চার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যৌবন-রাজ্যের প্রথম প্রবেশমুখে এই দুর্ঘটনায় অবশ্য তাঁহার মনঃপ্রাণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। দুর্ঘটনার আকস্মিকতা ও অচিন্তনীয়তায় তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য একেবারে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুরা অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে বঙ্কিম এ যাত্রা আর সাম্‌লাইতে পারিবেন না। সর্ব্বকার্য্যে বৈরাগ্য, নির্জ্জন প্রিয়তা, মানসিক শূন্যতা প্রভৃতি উৎকট বিরহের সকল লক্ষণই প্রকটিত হইয়াছিল। তবে তাঁহার সংসারের প্রাচীন, বিশেষতঃ প্রাচীনারা, বঙ্কিমের এইরূপ অবস্থার জন্য বিশেষ কিছু চিন্তিত হন নাই। মোটের উপর তাঁহারা মনে করিতেন, এ ব্যাধি "নাইতে খেতে সেরে যাবে।" পাঠক মহাশয়, অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, যে বঙ্কিম প্রথমে বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং এই সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কথা অপেক্ষা কার্য্যেই অধিক প্রতীয়মান হইত। এ অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত কি উচিত এ বিষয় লইয়া তিনি কখনও কোনও বন্ধুর সহিত তর্ক করা প্রয়োজন মনে করিতেন না। প্রাচীনারা বিবাহ করিতে তাঁহাদের অযৌক্তিক

যুক্তির সহিত তাঁহাকে অনুরোধ, কি পীড়াপীড়ি করিলে, বঙ্কিম মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইলেও মুখে "ইচ্ছা হইলেই বিবাহ করিব" ভিন্ন অন্য কোন কথা বলিতেন না; নিজ সহচর সঙ্গীদের সহিত কখনও পুনরায় বিবাহের অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন না।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পিতামাতা, বন্ধুরা, কত ভাল ভাল কন্যা দেখিয়া আসিল ও তাহাদের রূপ-গুণের সুখ্যাতি করিল কিন্তু বঙ্কিমের সঙ্কল্প কিছুতেই বিচলিত হইল না। তৎপরে, তাঁহারা বঙ্কিমকে কত কন্যা দেখাইবার জন্য কত চেষ্টা এবং বিবাহ না করিলেও কন্যা দেখিতে দোষ নাই বলিয়া তর্কের অবতারণা করিলেন, কিন্তু বঙ্কিম কন্যা দেখিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। তর্ককে তর্ক দ্বারা নির্জীব করা অনর্থক ভাবিয়া বঙ্কিম চুপ করিয়া থাকিতেন; কিন্তু কার্য্যকালে হঠাৎ কোন কারণ দেখাইয়া সরিয়া পড়িতেন। এইরূপে যখন তাঁহাকে কন্যা দেখান অসম্ভব বিবেচিত হইল তখন কোন চরিত্রজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শে কন্যাগণকে বাড়ীতে আনিয়া দেখান স্থির হইল। অনেক কন্যাকে বাড়ী আনিয়া দেখান হইল বটে কিন্তু বঙ্কিমের মন কিছুতেই ফিরিল না। এইরূপে বৎসর দুই কাটিয়া গেল অথচ তাঁহার বিবাহের কোন ইচ্ছাই দেখা গেল না; তখন অনেকেই মনে মনে নিজ নিজ বিজ্ঞতার উপর সন্দিহান হইল। পিতামাতা ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া নিজেদের চেষ্টা শিথিল করিলেন; বন্ধুবান্ধবেরা আর কদাচিৎ কোন উপলক্ষে দৃঢ়চিত্ততার উপমা দেওয়া ব্যতীত এ বিষয়ের আর উচ্চবাচ্য করিতেন না। তখন বঙ্কিম কতকটা সুস্থির বোধ করিলেন; কিন্তু যে শোকাগ্নি এতদিন অনুরোধের চাপে চাপা পড়িয়াছিল, এখন তাহা সমানভাবে জ্বলিতে লাগিল। সেই শোক-সম্ভোগের সহিত তৃপ্তি যে মিশ্রিত ছিল না, তাহা বলা

যায় না এবং সেই তৃপ্তিতেই তাহার দুঃখ ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া একটা অর্দ্ধদগ্ধাবস্থা ধারণ করিয়াছিল।

এইরূপে আরও কিছুকাল কাটিয়া গেল। এখন বঙ্কিমের মনে দুঃখের সহিত সুখের, অতৃপ্তির সহিত তৃপ্তির, সখ্যতা স্থাপিত হইয়াছে; এখন একজন অপরকে শত্রু কিম্বা নীচ বলিয়া বিবেচনা করে না, দুজনে, দুজনের তথায় বাসের অধিকার স্পষ্টতঃ ও অস্পষ্টতঃ স্বীকার করিত; স্বামীর নিকট দুজনে সমানভাবে অনুগ্রহ পাইয়া পরস্পর বিদ্বেষ করিত না, বরং, এক অন্যের অভাব সময়ে সময়ে অনুভব করিত; শিশুদের ন্যায় উভয়ের ক্ষীণ বিদ্বেষের সহিত গাঢ় ঘনিষ্টতা জড়িত ছিল। এইরূপ মানসিক অবস্থায় সময় কাটিয়া যাইতেছে; বঙ্কিম ক্ষুদ্র Xerxesর ন্যায় উচ্চে দণ্ডায়মান হইয়া সংসারের লীলা-খেলা, দ্বন্দ-ভালবাসা, আলস্য-উদ্যম, হাস্য-ক্রন্দন বৈদান্তিকের চিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছেন; নিজের মনে মনে একটা বিজ্ঞতার ধারণা হইয়াছে; সংসারের কাণ্ডকারখানা তাঁহার কাছে এখন অতি অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যস্কর বলিয়া বোধ হয়; কর্ম্মে উদ্যমও নাই, আলস্যও নাই, যেন কলের পুতুলের মত নিজ দৈনিক কার্য্য সারিয়া যাইতেছেন; ইচ্ছা যে সারাজীবন নির্জ্জনপাঠে ও দীনদরিদ্রের সেবায় অতিবাহিত করিবেন। ক্রমে দীনদুঃখীর সাহায্যকল্পে কিছু কিছু কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের ক্লেশের কথা তাঁহাকে প্রায়ই শুনিতে হইত। কন্যাদায়-গ্রস্থ পিতাদের দুঃখকাহিনী শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। কি করিয়া তাহাদের সাহায্য করা যায়? নিজ সাহায্যভাণ্ডার হইতে সামান্য অর্থে তাহাদের বিশেষ কোন উপকার হইবে না; অথচ বিনাপনে বিবাহ করিতে কিম্বা বিবাহ দিতে বর কিম্বা বরকর্ত্তা

অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। তাহার উপর কোন যুবক কিম্বা যুবকের পিতাকে অনুরোধ করিতে গেলে,তাহাকে প্রায়ই গঞ্জনা শুনিতে হইত; নিজেত বিনাপনে বিবাহ করিয়া উপকার করিতে পারেন—এরূপ বাক্য প্রায়ই তাঁহার কর্ণগোচর হইত। নিজের কার্য্যের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিলে তাহা স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। তাহাতে যে তাঁহার আন্তরিক ক্ষোভ হইত না এমন নহে; কখন কখন মনে হইত যে নিজে বিনাপনে বিবাহ করিয়া কোন দরিদ্র পিতার উপকার সাধন করিবেন কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা বেশীক্ষণ তাঁহার মনে স্থান পাইত না। "আর বিবাহ করিব না"—এই দৃঢ়-পণের পাদদেশে কখন কখন বিপরীত ইচ্ছা দেখা দিত কিন্তু তাহা প্রতিহত হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অদৃশ্য হইত।

এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে অনেকদিন পরে বঙ্কিমের জীবনে একটা নূতন ধরণের ঘটনা ঘটিয়া গেল। মানসিক শৈথিল্যের সময়ে বঙ্কিম কখন নিজ সম্ভাবিত মন-পরিবর্ত্তনের কথা কাহাকেও জানাইয়াছিলেন একথা এক কন্যার পিতার কর্ণে পৌছিয়াছিল। কন্যার নাম রাধা। রাধার পিতা অগ্রে সামান্য চাকরী করিতেন, এখন আর তাহা করিতে পারেন না। অগ্রে তিনটী কন্যা পার করিয়া নিঃস্ব হইয়াছেন; সংসারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মধ্যে মাত্র একটি পুত্র—অতি সামান্য বেতনে কোন সওদাগরী আপিসে কার্য্য করে। অতি কষ্টে দিনপাত হয়—তাহার উপর শীঘ্র শীঘ্র রাধার বিবাহ দিতে হইবে, কারণ রাধা ১৫ পার হইয়া ১৬ বৎসরে পড়িয়াছে। অনিন্দনীয়রূপ। তাহার অন্য ভগ্নীগণের রূপের বাকী বকেয়া যেন তাহাকেই প্রদত্ত হইয়াছে; রূপও যেমন মৃদুরশ্মিমান, গুণও সেইরূপ মৃদুভাবাপন্ন; সকলেই তাহার মঙ্গল কামনা করিত। পিতার ইচ্ছা

কন্যাকে একটু লেখাপড়া জানা ছেলের সহিত বিবাহ দেন—অগ্রে দুইটী কন্যা মূর্খের হাতে পড়িয়া অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়াছে। কেদার বাবু ( রাধার পিতা ) আসিয়া বঙ্কিমকে ধরিলেন। শুনিবা-মাত্র বঙ্কিম সে প্রস্তাব একেবারে প্রত্যাহার করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেদার বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি অনেক অনুনয়-বিনয়, যুক্তি-তর্ক দ্বারা বঙ্কিমের মত করিলেন; তিনি দেখিতে যাইবেন, তাহার পর বিবাহ না করেন তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। কেদার বাবুর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে কন্যাটি দেখিলে আর তাঁহার বিবাহ করিতে অমত হইবে না; এ পর্য্যন্ত যাহারা দেখিয়াছে তাহারা কেহই কন্যা অমত করেন নাই। বস্তুতঃ এক ধনী ভদ্র-লোকের মূর্খসন্তান রাধাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল, কিন্তু বাপের বড় ইচ্ছা যে এবার বিদ্বান্ জামাই করিবেন,—তা মেয়ে খেতে পায় আর না পায়।

যখন বঙ্কিম রাধাকে দেখিতে যাইতে সম্মত হইলেন, তখন কেদারবাবু রাধার পরিণয়বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন; কারণ যখন বঙ্কিম পণ লইবেন না, তখন বিবাহের অমতের অন্য কারণ থাকিতে পারে না। সানন্দে বৃদ্ধ বাটীতে খবর দিলেন যে এক মনোমতপাত্র এক প্রকার হস্তগত হইয়াছে। তারপর সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। নিজ বিজ্ঞতার ও বাকপটুতার সামান্য উল্লেখ করিতেও ছাড়িলেন না। সকলেরই ধারণা এই খানেই রাধার নিশ্চয় বিবাহ হইবে, কেবল কেদারবাবুর এক বিধবা কন্যা ক্ষীণস্বরে অনিশ্চয়তার ভাব জ্ঞাপন করিলে, তাহাতে স্পষ্টতঃ কেহ কিছু আপত্তি না করিলেও মনে মনে সকলেই বিরক্ত হইল।

ক্রমে কন্যাদেখার দিন আসিল। সে দিন শুধু কেদারবাবুর

পরিবারবর্গ নয়, পাড়াশুদ্ধ লোক যেন ব্যস্ত। পাড়ার সমবয়স্কা কন্যারা বেশভূষার সম্পাদনে, যুবতীরা তাহা প্রদর্শনে, প্রৌঢ়ারা নিজ নৈতিক দায়িত্ব প্রদর্শনের জন্য আগত। রাধার মন আজ দুঃসহ ভাবনার ভারে অবনত—যদি দেখিয়া পছন্দ না হয়, তাহা হইলে পিতামাতা ও অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের আরও ক্লেশ দেওয়া ব্যতীত নিজেকে সকলের কাছে কিরূপ লাঞ্ছিত হইতে হইবে! এরূপ মানসিক উত্তেজনায় রাধার সৌন্দর্য্য আজ অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে —যেন কোন অপরিচিতা দেববালা মরলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। যাহারা রাধাকে বহুদিন দেখিতেছে তাহারাও রাধার সেই অনৈস্বর্গিক মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া চমকিত হইল। পিতা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "রাধা, আজ কি জ্বর হইয়াছে?" ঈষৎ কম্পিতস্বরে রাধা উত্তর করিল "না, বাবা! আমার জ্বর হয়নি!" ক্রমে কন্যাদেখার সময় উপস্থিত হইল। কেদারবাবুর ন্যায় বঙ্কিমও রাধার পানে চাহিয়া একটু চমকিয়া উঠিলেন—এ কি দেখিতে আসিয়াছি! এই দেববালা মর্ত্ত্যবাসীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবে নাকি? না ইহারা আগন্তুক পাইয়া, তামাসা করিবার জন্য এক পুতুলকে সাজাইয়া আনিয়া তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে? কতকটা এই রকম ভাব বিদ্যুৎবেগে বঙ্কিমের মনমধ্য দিয়া চলিয়া গেল; প্রকৃতিস্থ হইয়া বঙ্কিম যথারীতি কন্যাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নকর্ত্তার সলজ্জভাব দেখিয়া কন্যাপক্ষীয়দের হইতে তাঁহার উপর দুইচারিটী leading প্রশ্ন হইল। উপস্থিত সকলেরই চক্ষু যেন একটা আনন্দে ও গর্ব্বে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। যেন তাহার অর্থ 'কেমন মেয়ে দেখাইয়া দিয়াছি, আর না বলিবার যো নাই'। মন হইতে প্রথম চাঞ্চল্য চলিয়া যাইবার পর, বঙ্কিমের মুখ অত্যন্ত

গম্ভীর আকার ধারণ করিল। কি ভয়ানক ভুল করিয়া ফেলিয়াছি! এখন কি করিয়া বলি কন্যা পছন্দ হইল না; যখন বিবাহ না করা স্থির, তখন কেনই বা দেখিতে আসিলাম। মনের মধ্যে এই সকল চিন্তা তোলপাড় হওয়ায়,বঙ্কিম কতকটা অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। পাশ হইতে এক প্রাচীনা বলিয়া উঠিলেন "আর লজ্জা কি; একবার অমত করেছ বলে কি আর মত ফেরাতে নেই?" বঙ্কিমের এ সকল কথা ভাল লাগিল না; কিন্তু কিছু উত্তর দিলেন না—নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। কন্যার ভ্রাতা অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার দেখা হয়েছে? রাধা এখন যেতে পারে?" বঙ্কিম সাগ্রহে উত্তর দিলেন "হাঁ যেতে পারে।"

রাধা চলিয়া গেল, বঙ্কিমও গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিলেন। রাধার ভ্রাতা কিছু জলযোগের জন্য পীড়াপীড়ি করিল কিন্তু বঙ্কিম অস্বীকার করিলেন। মতামত বলিবার জন্য এইবার সকলে ধরিয়া বসিল। বঙ্কিমও ব্যতিব্যস্ত হইলেন, বলিলেন "বাড়ী যাইয়া পত্র দ্বারা জানাইব"; কিন্তু কেহই সে কথা মঞ্জুর করিতে স্বীকৃত হইল না—প্রশ্নের পর প্রশ্নে বঙ্কিম আরও ব্যতিব্যস্ত হইলেন। "বিবেচনা করিয়া জানাইব" ব্যতীত অন্য উত্তর দিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই সন্তুষ্ট নহেন। বঙ্কিমও তাহাদের জেদ দেখিয়া সামান্য বিরক্ত হইলেন। এ দিকে বৃদ্ধ কেদারবাবু বঙ্কিমের উত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছেন; তাঁহার ইচ্ছা নিজে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না; পাছে লজ্জায় বঙ্কিম ঠিক কথা বলিতে না পারেন; কিন্তু যখন দেখিলেন উত্তর বাহির করিতে সকলেই বিফল হইল, তখন তিনি আর

স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে হুঁকাহস্তে বঙ্কিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমকে অনুনয়সূচকস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা—পছন্দ হয়েছে।" বঙ্কিম প্রথমে উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না; কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "অপছন্দ হবার ত' কোন কারণ নেই।" এই বলিয়া নীরব হইয়া বঙ্কিম কেদারবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহা একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে। একটু থামিয়া বলিলেন "বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাব।" কেদারবাবু অতি বিষণ্ণভাবে "আচ্ছা" বলিয়া বঙ্কিমকে বিদায় দিলেন।

বঙ্কিম যাইবার পর, কেদারবাবুর বাটীতে বঙ্কিমের কথার প্রকৃত অর্থ লইয়া বাকবিতণ্ডা পড়িয়া গেল। প্রধানতঃ তিন প্রকারের মতভেদ হইল।

১ম। বঙ্কিম বিবাহ করিবেন না;

২য়। বঙ্কিমের বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে; কিন্তু এখানে নয়;

৩য়। বঙ্কিম এখানে মত করিলেও করিতে পারেন।

কেদারবাবু প্রথম মতের পক্ষপাতী হইলেন; কিন্তু তথাপিও তিনি যে অন্তরে কিছু আশা পোষণ করিতেছিলেন না এমন নয়।

এখন বঙ্কিমের কথা বলি। কেদারবাবুর বাটী হইতে নিজ বাটীতে আসিয়াই বঙ্কিম মহাভাবনায় পতিত হইলেন। যদি কেহ তখন বঙ্কিমকে দেখিত, তাহা হইলে মনে করিত যে তাহার কোন মহা অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। ঘোর মানসিক উত্তেজনায় মুখমণ্ডল এক বিকটভাব ধারণ করিয়াছে। বঙ্কিম মনে মনে নিজেকে শত বার ধিক্কার দিতে লাগিলেন। যখন বিবাহ না করা স্থির, তখন কেন তিনি এরূপ বালকসুলভ দুর্ব্বলতা দেখাইলেন? কেন

কেদারবাবুর মনে আশা বাড়াইবার কার্য্য করিলেন; যতই কেদারবাবু ও বাটীর অন্যান্য লোকের মনে দারুণ কষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে আত্মগ্লানি জন্মিতে লাগিল। বঙ্কিমত বিবাহ করিয়া কেদারবাবুর মনস্তাপ নিবারন করিতে পারিতেন; সে দিকেও তাঁহার আত্মগরিমা তাঁহাকে বাধা দিল। এতদিন বিবাহ করেন নাই, যখন বিবাহ না করা স্থির, তখন অবস্থার বিপাকে পড়িয়া বিবাহ করিতে হইবে? কখনই নয়। Stoicএর ন্যায় অবস্থার উপরে নিজেকে স্থাপিত করিতে হইবে। মনের এরূপ বিষম অস্থির অবস্থায় কেদারবাবুকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কলম হাতে করিয়াও ঠিক নাই যে, কি জবাব দিবেন। ক্রমে লেখনী হইতে যাহা বাহির হইল তাহাই লেখা হইল; মনের মতলব আকারে পরিণত হইল; তাহার আর পরিবর্ত্তন হইল না।

একদিন পরেই বঙ্কিমের পত্র আসিল। সাগ্রহে তাহা মন্মথ(কেদার বাবুর পুত্র) পিতার হস্তে দিল। পিতা তাড়াতাড়ি খুলিয়া পাঠ করিয়া কিছু না বলিয়া পুত্তলিকাবৎ পুত্রকে দেখিতে দিলেন। পুত্র তাহা পড়িয়া বজ্রাহত হইল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল "মহাশয়, আমি অনেক বিবেচনা করিয়া আপনাকে লিখিতেছি, যে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না; মার্জ্জনা করিবেন।" ক্রমে পত্রের কথা বাড়ীর সকলে জানিতে পারিলেন। বাড়ীটা যেন এক অন্ধকারময় বিষণ্নতায় ছাইয়া গেল। সকলেই এখন একমত হইলেন যে বঙ্কিমের কন্যা পছন্দ হইয়াছিল কিন্তু কেদারবাবুর অবস্থা মন্দ বলিয়া বঙ্কিম বিবাহ করিতে সম্মত নন। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া রাধার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহার জন্য সকলকেই এত ক্লেশ, এত অবমাননা সহ্য করিতে হইতেছে—

পিতার সন্তাপ, ভ্রাতার ক্ষোভ, মাতার ক্রন্দন, ভগ্নিগণের দুঃখ—তাহার মৃত্যু হইলেই সকলের পক্ষে মঙ্গল হয়।

কেদারবাবু এখন নৈরাশ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর সুপাত্রের জন্য চেষ্টা করিবেন না; যাহার সঙ্গে হয় কন্যার বিবাহ দিবেন। পার্শ্বস্থ গ্রামের এক মূর্খ হীনাবস্থাপন্ন যুবক রাধাকে বিবাহ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিল। প্রধানতঃ পাত্র মূর্খ বলিয়া কেদারবাবু তাহাতে সম্মত হন নাই; এখন অগত্যা তাহারই সহিত রাধার বিবাহ স্থির করিলেন।

ক্রমে রাধার বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। বঙ্কিম খবর রাখিয়াছিলেন কোথায় রাধার বিবাহ হয়; শুনিয়াছিলেন রাধা সুপাত্রে অর্পিত হয় নাই। বিবাহের দিন তাহার মনে হইল সে তাহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজে যাইয়া কেদারবাবুকে নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন; কিন্তু স্বভাবতঃ শিথিলমনা, তাহার মতলব মনোমধ্যেই রহিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইল না।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাধার বিবাহের পর কিছুদিন গত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুখের স্থানে দুঃখ, দুঃখের স্থানে সুখ আসিয়াছে। নিরাশার স্থলে আশা, বৈরাগ্যের স্থলে ভোগেচ্ছা স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমেরও সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যখন পরিবর্ত্তনের সময় আসে তখন অতি সামান্য কারণেই তাহা ঘটিয়া থাকে। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর সহিত পরোপকারের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বঙ্কিম পরোপকার সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিতেছেন। বন্ধু cynicএর ন্যায় বলিতেছেন, পরোপকার বলিয়া এক পদার্থ পুস্তকের পাতায় থাকিতে পারে কিন্তু তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই; বাস্তবজগতে শুধু আত্মবিবৃদ্ধি (Self-aggrandisement) বলিয়া একটা পদার্থ আছে আর কিছুই নাই। এ বিষয় লইয়া মহাতর্ক উপস্থিত হইল। তর্কের ঘাত প্রতিঘাতে কিছু উষ্ণতার সঞ্চার হইল না এমন নহে। তখন যুক্তি ছাড়িয়া ক্রমশঃ ব্যক্তিগত মন্তব্য আরম্ভ হইল। তাহার মধ্যে বন্ধু বলিয়া উঠিল "তুমি যে পরোপকার ব্রতের মহত্ত্বের প্রচার করিতেছ, তুমিইত কেদারবাবু দরিদ্র বলিয়া তাহার সুন্দরী কন্যাকে ধনের অভাবে বিবাহ করিলে না।" বঙ্কিম উষ্ণভাবে একথার প্রতিবাদ করিলেন। ক্রমে তর্ক বিনা চরম নিষ্পত্তিতে শেষ হইয়া গেল। কিন্তু বঙ্কিমের মনে একটা আঘাত লাগিল। উহা কালক্ষেপের সহিত লোপ না পাইয়া বরং শান্ত মুহূর্ত্তে আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 'বন্ধু যাহা বলিয়াছে তাহাত ঠিক! যথার্থ পরোপকার করিতে গেলে, আমার কেদার বাবুর

কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করা কোন মতে উচিত হয় নাই'। এই অনুচিতকার্য্যের জ্ঞান অনেক সময় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিত। তর্কের এক বৎসর কাল পরে বঙ্কিমের বিবাহ হইয়া গেল—দরিদ্র পিতার সুন্দরী শান্তশিষ্টা কন্যার সহিত নহে, অর্থবান পিতার কুৎসিতা আদুরে মেয়ের সহিত। বন্ধুর বাক্যের সহিত এ ঘটনার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা বলা বড়ই কঠিন। একদিকে ঘটনা বহুদিবস অতীত হইয়াছে। আর অন্যদিকে কন্যার পিতার অভাব না থাকিলেও তিনি প্রিয় কন্যার রূপ ও গুণের অনুরূপ সুপাত্র না পাইয়া একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন এবং বঙ্কিম কন্যার পিতার মনঃস্তাপের কথা শুনিতে পাইয়াই মত দিয়াছিলেন—পণের লাভের প্রত্যাশায় নয়। যাহা হউক, বঙ্কিম বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু পরোপকার মহাব্রতের কছু দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

বঙ্কিমের বিবাহের পর বহুদিবস অতীত হইয়াছে। বঙ্কিম এখন একজন নামজাদা ডাক্তার—অনেক পয়সা উপায় করেন। সংসারের কোন অসচ্ছলতা নাই; কিন্তু অদৃষ্টের বিপাকে বঙ্কিমের মনে আদৌ সুখশান্তি নাই। তাহার একমাত্র কারণ—তাহার পত্নী নলিনীসুন্দরী। পিতৃগৃহের আদরাতিশয্যে তাহার মস্তিষ্কের এরূপ বিকৃতি হইয়াছিল যে, কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার ব্যবহার দেখিলে তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্কা বলিয়াই মনে করিত। বঙ্কিম ও নলিনীর দেহ-সৌন্দর্য্যের পার্থক্যই অসুখের প্রধান হেতু। বঙ্কিম, স্ত্রী তাদৃশ রূপবতী নহে বলিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে; বরং নলিনী পাছে কিছু মনে করে সেই জন্য তাহার একটু বেশী রকম মনরক্ষা করিয়া চলিতেন, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? নলিনী যে দেখিতে ভাল নয়, শুধু বঙ্কিম রূপবান বলিয়া লোকে একথা বলে। যে দিন প্রথম নলিনী স্বামীগৃহে নববধূ রূপে আসিয়াছিল, সেইদিন চতুর্দ্দোলা হইতে নামিবার কালীন কোন এক বর্ষীয়সী তাহাকে রূপবান বঙ্কিমের পার্শ্বে দেখিয়া কুক্ষণে বলিয়াছিলেন 'কার্ত্তিকের হাতে ঋাজল লতা'। চিরকাল পিতার আদরাতিশয্যে প্রতিপালিতা এবং সংসারের কর্ত্তা হইতে পরিচারিকা পর্য্যন্ত সকলের দ্বারা 'জগদ্ধাত্রী' 'লক্ষ্মী' ইত্যাদি বলিয়া প্রসংশিতা নলিনী তাহার রূপের উপর এই অভাবনীয় মন্তব্য আদৌ সহ্য করিতে পারিল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং চতুর্দ্দোলা হইতে নামিতে অস্বীকার করিল এবং স্বামীর পরিবারবর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাক্যানল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাকে জোর করিয়া নামান হইল।

সকলেই নববধূর আচরণে স্তম্ভিত হইল ও তাহার সম্মুখে অনেকে নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। ইহাতে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নলিনী সমস্ত দিন কাঁদে; শ্বশুর বাড়ীতে কিছুতেই থাকিবে না; না খাইয়া অনাহারে মরিবে। সংসারের সকলে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল এবং সকলেই বঙ্কিমের বধূ নির্ব্বাচনের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। এই সময়ে বঙ্কিমের মনে রাধার কথা—তাহার মনে দুঃখ দেওয়ায় তাহার এইরূপ হইয়াছে—এই কথা বারংবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল। অবশেষে সকলে ঠিক করিল নববধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তাহার পিতাকে খবর পাঠাইয়া আনান হইল। পিতার কাছে নলিনী সংসারের সকলের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিল ও প্রহার প্রভৃতি মিথ্যা কারণ দেখাইয়া স্বামীগৃহে তিলমাত্র থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। বঙ্কিমের বাটীর সকলেই নলিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে ব্যস্ত ছিলেন; সুতরাং, তাঁহাদের আর অধিক বলিতে হইল না। নলিনী চলিয়া গেল।

বিবাহের পর কয়েকমাস গত হইয়াছে। নলিনী ইহার মধ্যে শ্বশুরালয়ে দু এক বার আসে নাই এমন নয়; কিন্তু যথনই আসিয়াছে তথনই একটা না একটা 'কেলেঙ্কারী' করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম ইহার মধ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন—কলিকাতার একজন ভাল ডাক্তার বলিয়া তাঁহার বেশ পসার হইয়াছে। সংসারে অন্য কোন অসুখ নাই, শুধু পত্নীর জন্য তাঁহার মন সদা অশান্তিতে পূর্ণ। বঙ্কিম স্বভাবতঃ একটু সঙ্কোচশীল ( reserved ) প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাহারও কাছে নিজের অসুখের কথা প্রকাশ করিতেন না, এবং এই জন্যই তাঁহাকে আরও অধিক মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। এই অল্প বয়সে তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিম নিজ

পরিবারবর্গ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত বড় মেশামেশি করেন না। সর্ব্বদাই তাঁহার মন যেন কি এক চিন্তায় মগ্ন থাকে। এই অশান্তির মধ্যে তাঁহার একটা চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। তাঁহার মনে হইত যেন তাঁহার এক গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। রাধা ও তাহার পিতামাতার উপর তিনি যে ভীষণ অন্যায় করিয়াছেন, সে ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল; এবং সেই হেতুই তিনি নিজ অবস্থা নীরবে ও ধীরভাবে সহ্য করিতে পারিতেছিলেন। তিনি রাধার বিষয় পূর্ব্বে খবর লইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন তাহার পিতা হতাশায় উন্মাদবৎ হইয়া তাঁহার প্রত্যাখানের পর দেশের এক দুশ্চরিত্র ও মূর্খ পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; আরও জানিয়াছিলেন যে রাধার দুরবস্থার অবধি ছিল না। স্বামীর নিকট প্রহার, অনশনে দিবসযাপন, পরিবারবর্গের নিকট তিরস্কার প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখ পূর্ণমাত্রায় তাহার ভাগ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু রাধা সে সকল উচ্চাবস্থিতা দেবীর ন্যায় ধীর ভাবে সহ্য করিত। বঙ্কিম ভাবিতেন, রাধার উপর যে দুঃখ আসিয়াছে তাহার জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী ও তিনি যে দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহা তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তপক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। আজ ৪।৫ বৎসর হইল আর তাহার কোন খোঁজ খবর পান নাই; কিন্তু প্রায়ই তাহার কথা মনে পড়িত, আর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য নিজের উপর ঘৃণা জন্মিত।

দুই এক বৎসর হইতে নন্দিনী স্বামী-গৃহে একটু যেন ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতেছে ও বেশীদিন করিয়া থাকা আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু সে প্রায়ই স্বামী ও পরিবারবর্গের উপরে রাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে একটা নূতন রোগে ধরিয়াছে। এখন স্বামীর

উপর আক্রোশের প্রধান কারণ স্বামীর চরিত্রের উপর সন্দেহ, ও পরিবারবর্গের উপর অসন্তোষের কারণ, যে তাহারা তাহাকে কর্ত্রী বলিয়া যথেষ্ট মান্য করে না। নলিনী দিবারাত্রই স্বপ্ন দেখিত যে বঙ্কিম সর্ব্বদাই অন্য স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতেছেন; দরজার ফাঁক দিয়া দেখিত Dispensaryর ঘরে কে আসিতেছে ও যাইতেছে, সর্ব্বদা খবর লইত, কোথায় হইতে call আসে; এমন কি তাহার এক বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে কখন কখন গোপনে রোগীদের বাড়ীতে খবর লইতে পাঠাইত—কে রোগী এবং কিরূপ রোগ ইত্যাদি। বঙ্কিমের কাছে এ সমস্ত চাপা থাকিত না। তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন ও সময়ে সময়ে যখন আর সহ্য করিতে পারিতেন না, তখন স্ত্রীকে এই অহেতুক সন্দেহ ও তাহার কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করিতেন। তাহার ফলে নলিনী রাগ করিয়া বাপের বাটীতে চলিয়া যাইত। কিন্তু সেখানে আবার বেশীদিন থাকিতে পারিত না। তাহার অনুপস্থিতিতে স্বামী নিশ্চয় বিশেষ অন্যায় আচরণ করিতে-ছেন—হঠাৎ আসিলেই একটা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, এইরূপ চিন্তায় তাড়িত হইয়া নলিনী হঠাৎ স্বামী-গৃহে আসিত ও কোন প্রমাণ না পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইত। আবার কিছুদিন থাকিয়া এইরূপ ঘটনার পুনরভিনয় হইত। পত্নীর এই মানসিক রোগ ও তজ্জনিত আচরণ সমূহের দ্বারা বঙ্কিম অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া কোথায় গৃহে একটু শান্তি ভোগ করিবেন, তা নয় গৃহে পদার্পণ মাত্রেই পত্নী একটা না একটা ছল করিয়া একটা বৃহৎ কাণ্ডের সৃষ্টি করিত। সময়ে সময়ে তিনি বিরক্তিতে উন্মাদবৎ হইয়া মনে করিতেন গৃহ ছাড়িয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন। দুই একবার যে

রাগ করিয়া চলিয়া যান নাই, এমন নহে ; আবার সব দিক ভাবিয়া ফিরিয়া আসিতেন। জ্বালাতন হইয়া কখন কখন স্ত্রীর প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেন, আর তদুত্তরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে দশগুণ শুনাইতে ত্রুটি করিতেন না। বঙ্কিমের সহিত বিবাহে তাহার অশেষ সৌভাগ্য ও নলিনীর পিতার দয়া প্রকাশ, বঙ্কিমের বাটী তাহার বাপের বাটীর ভৃত্যের বাসের অযোগ্য, বঙ্কিমের কখন গর্দ্দভ, কখন মেষ, কখন কুক্কুর প্রকৃতি ধারণের কথা—নলিনী নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রকাশ করিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে বঙ্কিম পত্নীর নিকট হইতে এই ভাবের এক সুদীর্ঘ ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়াছেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে একজন স্ত্রীলোক নীচে ডাকিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলে না, কেবল কাঁদে ও ডাক্তার বাবুকে শীঘ্র ডাকিয়া দিতে বলে। বঙ্কিম বুঝিলেন কোন দরিদ্রা স্ত্রীলোক বিপদে পড়িয়া আসিয়াছে। জীবনের অশান্তি তাহার হৃদয়ের পরদুঃখকাতরতারূপ স্বাভাবিক গুণকে বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছিল ; পরোপকার যে শুধু মহাব্রত নয় কিন্তু অনেক মানসিক অশান্তির শক্তিপ্রদ ঔষধি তাহা এতদিনে শুধু বাক্যে নয়—কার্য্যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জীবনকে সেই এক উদ্দেশ্যে চালিত করিবার নিমিত্তই, তিনি যেন চির অশান্তির মধ্য দিয়া উহাকে কোনরূপে পূর্ণ ও অভগ্ন অবস্থায় চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। দুঃখিনী স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া মানসিক অবসাদ স্বত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। এদিকে নলিনীসুন্দরী (যিনি নিজ রৌদ্র অভিনয়ান্তে পার্শ্বগৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন) তথা হইতে ভৃত্যের সমস্ত কথা শুনিতে পাইল ও বুঝিল, একজন স্ত্রীলোক

বাবুকে ডাকিতে আসিয়াছে। ভৃত্যের কাছে কারণ কিছু বলে না, ক্রন্দন করিতেছে ও ডাক্তার বাবুকে শীঘ্র আসিতে হুকুম করিতেছে। তাহার আর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। কোন স্বামীর পরিচিতা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক বাবুকে সান্ধ্য বিহারে ডাকিতে আসিয়াছে। কাঁদিতেছে কেন? ওইটাতেই একটু গোল। আর গোলই বা কি? উহা অতি সহজবোধ্য। নিশ্চয়ই তাহার তাহার তাড়নায় স্বামী দুইতিনদিন কুলটার সহিত দেখা করিতে পারেন নাই; পাপীয়সী সেইজন্য বাড়ী বহিয়া আসিয়াছে ও বেশ্যাসুলভ ক্রন্দন করিতেছে। বঙ্কিম যেমন তাড়াতাড়ি নীচে আসিলেন, অমনি কিছুক্ষণপরেই নলিনী পার্শ্বের ঘরে আসিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন। বঙ্কিম আসিয়া দেখিলেন একটী শত-গ্রন্থিযুক্ত মলিনবস্ত্রপরিহিতা স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠিতা হইয়া দরজার পার্শ্বে জড়সড় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গে একটী ছোট ছেলে, দেখিলে বোধ হয় বাঙ্গালীর ঘরের নয়। রমণীকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কিছু বলিতে পারে না, কেবল কাঁদে। পরে বারংবার জিজ্ঞাসা করায় বালকের মুখ হইতে জানিতে পারিলেন যে, স্ত্রীলোকটীর স্বামী বহুদিন যাবৎ কাশরোগে পীড়িত; অর্থাভাবে ভাল চিকিৎসা করাইতে পারেন নাই। সম্প্রতি রোগ আরও বাড়িয়াছে; আজ সকাল হইতে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্কিম বুঝিতে পারিল যে বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। সত্বর গাড়ী ডাকিয়া, নিজে স্ত্রীলোক ও বালকটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে নলিনী দরজার পার্শ্ব হইতে যাহা দেখিলেন তাহাতে বুঝিলেন যে এক সুন্দরী গৌরবরণী যুবতী আসিয়াছে; তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কি যে হইল সমস্ত বুঝিতে না পারিলেও যন্ত্রণা ইত্যাদি যে দুইএকটী কথা শুনিতে পাইল তাহাতে সমস্ত ব্যাপারটী বুঝিতে বাকি রহিল না। সমস্ত data একত্র করিয়া

স্বামীর দুশ্চরিত্রতার বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইল। একবার ইচ্ছা হইল নিজে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সমস্ত সন্ধান লইয়া আসে। পরক্ষণেই সে মানসিক বেগ দমন করিয়া স্থির করিল যে ব্যাপার আরও গুরুতর হউক; অনেকবার ঠকিয়াছে, এবার আর ঠকিবে না।

বঙ্কিম রোগীর বাড়ীতে যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, ভগবান মানুষকে এত কষ্টেও ফেলেন। শুনিলেন, রোগী কলিকাতার বাহির হইতে ৫।৭ দিন হইল ডাক্তার দেখাইবে বলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতদিন অর্থের অভাবে তাহা হয় নাই। দুই একখানা তৈজস পত্র যাহা অভাগিনী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল তাহা ডাক্তার দেখাইবার খরচের জন্য বিক্রয় করা হইয়াছে। ক্রেতা সুবিধা বুঝিয়া তাহা অতি অল্প মূল্যেই কিনিয়াছে। এখন আসবাবের মধ্যে খান-কতক মৃণ্ময়পাত্র, একটী ছেঁড়া কাঁথা, একটী ছেঁড়া মাদুর, একটি ভাঙ্গা ট্রাঙ্ক ও খানকতক কাপড়। রোগীর ঘরটী অতি ক্ষুদ্র ও একটী অন্ধকারময় বস্তির মধ্যে। মাটির মেজে—ভিজা ও সেঁতসেঁতে, অনবরত জল উঠিতেছে। গবাক্ষ আদৌ নাই; মাত্র একটী নীচু দরজা; বস্তির চারিদিক আবর্জ্জনায় পূর্ণ, মাঝে মাঝে দুর্গন্ধময় ড্রেন,দিনরাত্র মাছির ঝাঁক উড়িয়া বেড়াইতেছে। সেখানে নানা জাতীয় ও নানা চরিত্রের লোক বাস করে। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা, বাঙ্গালী মজুর, চোর, বদমাইস, গাঁটকাটা, থানকিদার, ঝি, বেশ্যা, দরিদ্রগৃহস্থপরিবার,—সকলেই পাশাপাশি বসবাস করিতেছে। অধিবাসীরা বিভিন্ন শ্রেণীর হইলেও সকলেই কিন্তু সমানভাবে অপরিচ্ছন্নতাপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। বস্তিটা যেন একটী অপরিচ্ছন্নতার প্রদর্শনী বিশেষ।

বঙ্কিম কার্য্য উপলক্ষে অনেক অনেক বস্তিতে গিয়াছেন কিন্তু এরূপ ভীষণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে কখন গমন করেন নাই। বুঝিলেন গরীবলোকে অল্প ঘরভাড়ার জন্য বাধ্য হইয়া এরূপ স্থানে আগমন করে।

বঙ্কিম দেখিলেন রোগী ক্ষয়কাশ রোগে ভুগিতেছে; শেষ অবস্থা; বাঁচিবার আশা খুব কম। তাহার উপর রোগীর বাসগৃহের যেরূপ অবস্থা তাহাতেই তাহার মৃত্যু টানিয়া আনিবে। পথ্যের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই কিম্বা অর্থাভাবে তাহা হইতে পারে নাই। বঙ্কিম যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন স্ত্রীলোটী তাহার হিন্দুস্থানী ছেলেটীর দ্বারা উত্তর দিতে লাগিলেন। বঙ্কিম দেখিলেন রোগী প্রলাপ বকিতেছে, যেন পাহারাওয়ালা তাহাকে রাস্তায় মাতলামি করিবার জন্য ধরিয়াছে। তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য রোগী সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিল "রাধা ধর" "রাধা ধর।"

বঙ্কিম চমকিয়া উঠিলেন। এতদিন পরে কাহার নাম শুনিলেন? এ কোন রাধা? রাধা-নাম ত অনেকেরই আছে। এই নামের সহিত বঙ্কিমের জীবনের অনেক সুখদুঃখ জড়িত ছিল। ঔৎ-সুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিলেন রোগী কোথা হইতে আসিয়াছে। রমণী বালকের দ্বারা বলিল "মতিপুর"। বঙ্কিম আরও স্তম্ভিত হইলেন। এ কি তবে সেই রাধা? যাহার সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? যে বিবাহের প্রস্তাব তিনি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন? আরও কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর তিনি এ রমণী যে সেই রাধা তদ্বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন। এখন তিনি রোগীর কথা সম্যক ভুলিয়া গিয়াছেন।

তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল। তাহার মনে হইল কে যেন তাহার নৃশংসতার পূর্ণচিত্র তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। কে যেন তাহার নিজের কোন হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যের উপর তাহার নয়ন ফিরাইয়া ধরিয়াছে; তাহার মনে হইল যেন তাহার শাস্তির পূর্ব্বে তাহাকে তাহার কৃত পাপকার্য্য সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। বঙ্কিম ভাবিলেন কি ভীষণ অপরাধই না করিয়াছেন এবং তার শাস্তি কতই না ভীষণ হইবে। তাহার মন আতঙ্কে ও নিরাশায় পূর্ণ হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। শুধু শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিনিট কতক এই ভাবে গেল। পরে রোগীর আর্ত্তনাদে তাহার চমক ভাঙ্গিল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন এই নারীর যা কিছু বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার জন্য তিনিই দায়ী। তিনি তাঁহার পিতাকে ক্রুরভাবে হতাশ-সাগরে নিক্ষেপ না করিলে রাধার আজ এরূপ দুর্দ্দশা হইত না, আজ তাহার এরূপ স্থানে বাস, এরূপ পরিধান,এই ভাবে দিবসযাপন, এইরূপে তাহার অনুগ্রহের অপেক্ষা করিতে হইত না। তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিল। ছল করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়া তিনি চক্ষু মুছিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন বালিকাটি দুটি টাকা হস্তে করিয়া তাহাকে দিতে আসিল। বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিলেন "টাকা কিসের?" এবার রাধা নিজে বলিল "আপনার ফি, গরিব মানুষ বেশী দিতে পারব না।" এই কথায় বঙ্কিমের আত্মপ্রাসাদে বেশ একটু আঘাত পাইল। হঠাৎ যেন বুঝিলেন লোকের তাঁহার ও তাহার সমব্যবসায়ীর উপর কিরূপ ধারণা। এইরূপ দুর্দ্দশাপন্না রমণী-যাহার নিজের খাইবার সংস্থান নাই সেও. বিনাদর্শনীতে ডাক্তার

ডাকিতে ভরসা করে না। সেও জানে যে সে যতই দরিদ্রা হউক না কেন তাহাতে আর ডাক্তার বাবুর দয়ার কোন কারণ নাই। তাহাদের দয়াশীলতা ও চরিত্রবানতার উপর এমন উচ্চ ধারণা যে তাহারা নিজেরা অনাহারে থাকিয়া বুভুক্ষু ডাক্তার বাবুর উদর পূর্ণ করিতে হইবে। বঙ্কিম টাকা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "আমাকে কিছু দিতে হবে না।" আরও বলিলেন "যেরূপ রোগ তাহাতে এরূপ জায়গায় থাকিলে কোনরূপে সারিবার আশা নাই। ভাল বাড়ীতে থাকিতে হইবে ও পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" তাহার কথায় রাধা বলিল "গরিব মানুষ, কোথায় পাব?" বঙ্কিম উত্তর দিলেন, "তাহার জন্য আপনার চিন্তা নাই; আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া বঙ্কিম চলিয়া গেলেন ও গাড়ীতে উঠিবার সময় নিজ সহিসকে দিয়া রোগীর পথ্যের জন্য একখানা দশ টাকার নোট পাঠাইয়া দিলেন ও সঙ্গে একখানা পত্রে দু'চার লাইন লিখিয়া দিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল 'আপনি এই সামান্য টাকা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি কল্য আপনাদের অন্য বাড়ীতে স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।' পত্র পাইয়া রাধার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। মানুষ এত দয়ালু, এত মহাপ্রাণ হয়! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে মানবকে বন্য পশুর অপেক্ষা মমতাহীন ও স্বার্থপর মনে করিতে-ছিল, ইনি কি তাহাদের একজন! এই মাত্র তিনি মনে মনে বিধাতার কত নিন্দাবাদ করিতেছিলেন। বিধাতা কি শিক্ষাদিবার জন্য ইঁহাকে তাহার সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন! রাধা সহস্রবার ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও ডাক্তার বাবুর কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন।

# চতুর্থ অধ্যায়।

বঙ্কিম বাড়ী ফিরিয়া যাইবার কালীন ভাবিলেন রাধাকে ও তাঁহার স্বামীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া রাখিবেন। কিন্তু নিজ স্ত্রীর উদার প্রকৃতির বিষয় সম্যক অবগত থাকায় তিনি সে সঙ্কল্প শীঘ্রই ত্যাগ করিলেন। তৎপরে স্থির করিলেন যে, নিজের বাড়ীর নিকট একটি বাটি ভাড়া করিবেন। কিন্তু নলিনীকে তাহা জানান হইবে না, কারণ তাহা হইলে বহু অনর্থের সম্ভাবনা। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বঙ্কিম নিজগৃহে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নলিনী কিন্তু এতক্ষণ অলস ছিল না। পৃথিবীর মধ্যে তাহার একমাত্র প্রিয়পাত্রী জয়ানাম্নী এক প্রৌঢ়া পরিচারিকার সহিত গভীর পরামর্শে মগ্ন ছিল। এরূপ সুযোগ আর হইবে না—এবারে খুব সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। নিজের কার্য্যে অগ্রসর হইবার সমস্ত রাস্তা ঠিক করিয়া স্বামীর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। বঙ্কিম আসিয়াই দেখিলেন নলিনী এখন ভীষণা ভৈরবীরূপিনী নয়—স্মিতমুখী প্রফুল্লবদনা। বহুদিন যাবৎ স্ত্রীর এমন শান্ত মূর্ত্তি বঙ্কিম দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। তিনি একটু বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন ইহার ভিতরে কিছু মতলব আছে। আবার তৎক্ষণাৎ নিজ চিত্তকে ধিক্কার দিয়া মনে করিলেন নলিনা নিজ ব্যবহারের জন্য দুঃখিতা হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। আজ নলিনী নিজ মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আর বঙ্কিম ততবার তাহাকে প্রেমময় স্বামীর ন্যায় সান্ত্বনা করিলেন। ইহার মধ্যে

নলিনী স্বামীর মানসিক অবস্থা পর্য্যাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত ছিল। দেখিল বঙ্কিম আজ বড় অন্যমনস্ক; যেন মন বিশেষ কি ভাবনায় মগ্ন। একবার চেষ্টাকৃত ভালবাসার স্বরে বলিল "তোমার কোন অসুখ হইয়াছে নাকি?" বঙ্কিম সামলাইয়া উঠিয়া বলিলেন "না কিছু নয়? আজ বড় ঘোরাফেরা হইয়াছে. তাই শরীর কিছু অবসন্ন বোধ হচ্চে।" নলিনীর ঘোর সন্দেহ এখন দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। একবার ক্রোধ সব চাপ ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল কিন্তু নলিনী তাহা অতি কষ্টে দমন করিল।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। বঙ্কিম ঠিক করিয়াছিলেন রোগীকে ওরূপ অবস্থায় বস্তীর বাসায় থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে না। তাহাতে তাহার আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না; নানারূপ চিন্তার পর স্থির করিলেন রোগীকে নিজের বাটীর নিকটে একটী বাটী ভাড়া করিয়া দিবেন। তাহা হইলে তিনি সর্ব্বদা দেখা শুনা করিতে পারিতে পারিবেন। অনেক চিন্তার পর ইহাও স্থির করিলেন যে স্ত্রীকে সে কথা বলা হইবে না। তাহাতে তাহার মানসিক রোগ আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া পরদিন প্রত্যুষেই বঙ্কিম রাধার স্বামীকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন ঔষধে কিঞ্চিৎ ফল হইয়াছে। রাধা বঙ্কিমকে দেখিবা-মাত্রই অশ্রুপূর্ণ নয়নে দূর হইতেই প্রণাম করিল ও রোগী কিঞ্চিৎ ভাল অবস্থার সাগ্রহে জানাইল। বঙ্কিম তাহাদের স্থানান্তরিত করিবার মতলব প্রকাশ করিলেন। উপকারীর উপর অযথা ভার হইবে ভাবিয়া রাধা প্রথমে একটু অমত করিল। কিন্তু স্বামীর মঙ্গলের আশায় শীঘ্র মত ফিরাইল। ডাক্তার বাবু বলিলেন "আমি বাটী ঠিক করিয়া আসিয়াছি, এখনই যাইতে

হইবে।” ঘরের যৎসামান্য জিনিষ লইয়া রাধা তাহার স্বামীর সহিত একটী ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বঙ্কিমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া একটী দ্বিতল বাটীতে উপস্থিত হইল। তথায় একটী চাকরকে সমস্ত বন্দবস্ত করিয়া দিবার হুকুম দিয়া তিনি সঙ্কুচিত মনে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিবার সময় মনে হইল যেন অকস্মাৎ কিছু অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন, কিম্বা ঠিক কিছু অপরাধ না করিলেও তাহাকে শীঘ্র কোন অপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে বলিয়া তাহার ভয় হইতে ছিল। আর যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহা বলিতে বলিতে ঘটিল। স্ত্রী প্রত্যূষে তাহাকে বহির্গমনের কথা এবং প্রত্যাগমনে এত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্কিম সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টায় একেবারে অনভ্যস্ততাবশতঃ অসংলগ্ন উত্তর দিতে লাগিলেন। নলিনীর মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল ক্রোধ চাপিতে না পারিয়া বলিলেন, “তুমি মনে কর আমি বড় বোকা। আমি কিছু বুঝি না।”

বঙ্কিম বলিলেন “কি বুঝিলে বল।” নলিনী ক্রোধ চাপিয়া জোর পূর্ব্বক হাসিয়া বলিলেন “বলিব কেন—”

বঙ্কিম কথা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন,—“তোমার ত মনে দিনরাত একই কথা তোলাপাড়া।” এই খানে এখন চুকিয়া গেল।

নলিনী উঠিয়া জয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়া বঙ্কিমের কোচমানের সহিত সাক্ষাৎ করিল ও কৌশলে বাবু গত দিবস সন্ধ্যায় কোথায় গিয়াছিলেন খোঁজ লইল। শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া কর্ত্রীকে আশু সাফল্য সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া কোচওয়ান কথিত

স্থানে গমন করিল ও সেখানে যাইয়া শুনিল একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক একটী রোগীকে লইয়া আসিয়াছিল। একটী বাবু আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

জয়া আসিয়া নলিনীকে নিজ কার্য্য কুশলতার কথা অত্যাধিক বিনয়ের সহিত বারংবার উল্লেখ করিয়া নিজের অনুসন্ধানের ফল বর্ণনা করিল ও তৎসম্বন্ধে বস্তীর লোকদের যুবতীর উপর বাবুর অনুগ্রহের অতিবর্ণনা দশগুণ রঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করিল। নলিনীর মানসিক অশান্তির সীমা রহিল না। সে কি করিবে—নিজে মরিবে কি স্বামীকে মারিবে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না। জয়ার পরামর্শে আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশায় চুপ করিয়া রহিল। স্থির হইল বাবু কোন্ পাপীয়সীর প্রণয়ে মুগ্ধ খুজিয়া বাহির করিতে হইবে ও তৎপরে অপরাধীদ্বয়কে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। এইরূপ মনে করিয়া কতক শান্ত হইল। কিন্তু স্বামীর সহিত ক্রোধ চাপিয়া আলাপ করিবার শক্তি তাহার আর রহিল না। স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা একরূপ বন্ধ হইল। বঙ্কিমও কতকটা মনে মনে আশ্বস্ত হইলেন।

এইরূপ দুই একদিন চলিয়া গেল। বঙ্কিম প্রত্যহ রাধার বাটীতে যাইয়া রোগীর সংবাদ লন ও সংসারের অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। দুইবার একবার যাইতে যাইতে এখন তিনি সময় পাইলে যাইয়া থাকেন। রোগী আশঙ্কার অতীত না হইলেও যেন একটু ভাল হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

রাধা এখন বঙ্কিমের সহিত কথা কয়। তাহাদের মধ্যে একটু আত্মীয়তার ভাব স্থাপিত হইয়াছে। রাধা বঙ্কিমকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত আর বঙ্কিম রাধাকে ক্ষমাময়ী জননীর

ন্যায় দেখিতেন। স্বামী আরোগ্য হইবার আশায় রাধার মন একটু প্রফুল্ল হইয়াছে। তাহার মনে ক্ষোভ যে উপকারীকে সম্যকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় না। আবার সাক্ষাৎ হইলে জানাইতে গেলে কথা যেন মুখে আটকাইয়া যায়। এদিকে বঙ্কিমের এমন মনের ভাব যে, রাধার স্বামীকে যদি কোন রকমে বাঁচাইতে পারি তাহা হইলে তাহার অমানুষিকতার কতক প্রতিকার হইবে। তাহার প্রাণপণ চেষ্টা কিসে রোগী ভাল হইবে; ইচ্ছা হয় কোন দৈবশক্তি লাভ করিয়া রোগীকে শীঘ্র আরোগ্য করেন। এইরূপে নিজ অপরাধ ক্ষালনের অবসর প্রাপ্ত হইবার জন্য বঙ্কিম ভগবানকে মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

এদিকে নলীনির মনের অবস্থা অন্যরূপ। মনের আগুন চাপিয়া রাখায় তাহার একরূপ বিকার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যেন সর্ব্বদাই শুনিতে পায় যে স্বামী এক সুন্দরীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে ও তাহার নিন্দাবাদ করিতেছে। একটু শব্দ শুনিলেই মনে করিত যেন কাহার ইসারায় স্বামী পার্শ্বের ঘরে গোপনে উঠিয়া যাইতেছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে যেন স্বামীর প্রণয়ীণিকে ধরিয়াছে মনে করিয়া জাগিয়া উঠিত। তাহার মানসিক অশান্তির আর সীমা রহিল না। এদিকে জয়া বাটীর তল্লাসে নিযুক্ত। বাবুর পিছু যাইতে পারে না, কাজেই তিনি কোন স্থানে গমন করেন তাহা ঠিক করিতে পারে না। নলিনী ইহা জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আর জয়ার চেষ্টা যতই নিস্ফল হইতে লাগিল নলিনীর ব্যগ্রতা ততই বাড়িতে লাগিল। তখন তাহার জীবনধারণ যেন শুধু স্বামীর প্রণয়িণীর সন্ধান লইবার জন্য।

আজ সকালে উঠিয়া নলিনী জয়াকে বড় তিরস্কার করিয়াছে।

আর স্পষ্ট বলিয়াছে যে যদি আজ সন্ধ্যার ভিতর নিজ কার্য্যে সফল না হয় তাহা হইলে তাহার চাকরী যাইবে। জয়া ভয়ানক অশান্ত-চিত্তে গৃহ হইতে বাহির হইল। কোথায় তল্লাস করিবে কিছুই ঠিকানা নাই যে দিকে চক্ষু গেল সে দিকেই যাইল। এইরূপ আন-মনে যাইতে যাইতে শ্রান্ত হইয়া এক বাড়ীর বাহিরের বারাণ্ডার উপর বসিয়া পড়িল; বসিয়া ভাবিতে লাগিল—তাহারও কোন একটা নিশ্চিৎ বিষয় নাই; এইরূপ অন্যমনস্ক মনে ভাবিতেছে এমন সময়ে সেই বাটীর সম্মুখে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া থামিল। তাহাতে তাহার মানসিক তন্দ্রা যেন ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, বঙ্কিম বাবু তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। জয়ার মনে হইল বাবু এই বাটীতে রমণীকে রাখিয়াছেন। সে সেই গাড়ী ভাড়া করিয়া কর্ত্রীর নিকট গেল ও তাহাকে জানাইল। নলিনী যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই সেই গাড়ী করিয়া চলিয়া আসিল।

বঙ্কিমের এইরূপ গোপনে আসিবার বিশেষ কি কোন কারণ ছিল? তিনি অনেক সময় নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু ভাল কোন উত্তর পান নাই। লোক বুঝাইতে হইলে তিনি অবশ্য বলিতেন যে তাহার গৃহে শান্তির নিমিত্ত তিনি এইরূপ করিতেন। কিন্তু এই কয়ফিয়তে তাহার আত্মার শান্তি হইত না। আর কি অন্য কারণ আছে? মনের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিতে বঙ্কিমের সাহস হইত না। অথচ তিনি স্পষ্টভাবে কিম্বা অস্পষ্টভাবে হউক জানিতেন যে কোথায় একটি অতি সূক্ষ্ম কারণ মনের কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহাকে বাহির করিয়া নিরীক্ষণ করিবার তাহার ভরসা ছিল না—কি

জানি কি ভয়ানক অপ্রিয় সত্য বাহির হইয়া পড়ে। একদিন মনে হঠাৎ উদয় হইয়াছিল তিনি কি রাধার প্রতি কথাটা মনে সম্পূর্ণ উদয় না হইতে হইতেই তিনি ত্রস্তভাবে স্থান ত্যাগ করিয়া মনকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আজ তিনি রাধার বাটীতে আসিয়াছেন; অবশ্য রোগীর খবর লইতে, কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত ভারগ্রস্ত; কি যেন মহান অনর্থ তাহার দিকে ধাইয়া আসিতেছে, তিনি জানিয়াও জানিতে পারিতেছেন না অথচ তাহার ছায়া তাহার উপর যেন অগ্রেই পড়িয়াছে। আজ তিনি আসিয়াছেন; রোগীর খবর লইতে, কিন্তু ভিতরে যেন আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে যাহা তিনি নিজে ভালরূপ জানেন না কিম্বা জানিবার চেষ্টাও করেন নাই। তিনি অত্যন্ত আলোড়নপূর্ণ চিত্তে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন যে আজ রোগীর অন্য উপসর্গ কম হইলেও দুর্ব্বলতা অধিক। রোগী ঘুমাইতেছে তাহাকে বেশী নাড়াচাড়া না করিয়া রাধার দিকে চাহিলেন। প্রত্যেক দিনের ন্যায় রাধা জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি রকম দেখিলেন।" বঙ্কিম যথাযথ অবস্থা বলিয়া কহিলেন "এখন রোগীর অবস্থা অতি সঙ্গিন, রোগী বিপদের ও আরোগ্যের ঠিক মাঝখানে। এই সময়ে রোগীকে অতি সাবধানে রাখিতে হইবে। এখন হইতে অবস্থা মন্দও হইতে পারে কিম্বা ভালও হইতে পারে, কিন্তু মন্দ হইলে অন্যদিকে ফিরান যাইবে না।" তাহার পর উপযুক্ত উপদেশ দিয়া তিনি পার্শ্বের ঘরে আসিলেন। পার্শ্বের ঘরে অন্য আসনের অভাবে বিছানার উপরে বসিলেন। রাধা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সাংসারিক অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। রাধা এখন বঙ্কিমের সম্মুখে

কথা কয়। প্রত্যেকদিন দেখা হওয়ায় ও তাহার নিকট অচিন্ত-পুর্ব্ব উপকার পাওয়ায় তাহার সহিত এত দূরত্ব রাখা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হওয়া অনুচিত বিবেচনা করে না। বঙ্কিমও তাহার সহিত যথেষ্ঠ সম্মানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। আজ কথাবার্ত্তার মধ্যে রাধা স্বামীর আরোগ্যের আর কত দেরী আছে জিজ্ঞাসা করিল। বঙ্কিম বলিলেন "তাহাত ঠিক বলিতে পারি না"

রাধা—বাড়ী হইতে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রায়ই চিঠি আসিতেছে।

বঙ্কিম—কেন, আপনার কি আর এখানে থাকিতে ভাল লাগে না?

কথাটা রাধার কাণে কেমন কেমন লাগিল। ত্রস্তভাবে বঙ্কিমের মুখের দিকে চাহিল যাহা দেখিল তাহাতে আরও ভয় হইল। চকিতা হরিণীর ন্যায় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল এক রমণী উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, কেশ আলুথালু, বস্ত্র বিপর্য্যস্ত, চলন ভঙ্গিমা ভীষণা উন্মাদগ্রস্থার ন্যায়। রাধার দিকে চাহিয়া ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে বলিল "হাঁ, এরি জন্য রোজ লুকাইয়া আসা হয়; ভাল তোমাদের গোপনে দেখা আজ শেষ করচি।" এই বলিয়া মেজ হইতে এক গাছা ঝাঁটা লইয়া রাধার গায়ে দুই চারি ঘা বসাইয়া দিল। রাধা ব্যাপার কিছু না বুঝিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী রোগীর ঘরে আশ্রয় লইল; নলিনী সেখানে যাইয়াও, বঙ্কিম ধরিবার পূর্ব্বে, আবার মারিল ও উচ্চৈস্বরে বঙ্কিমকে ও রাধাকে গালিগালাজ দিতে লাগিল। একটা ভীষণ গোলমাল পড়িয়া গেল। রোগী বিছানায় শুইয়াছিল হঠাৎ এইরূপ গোলমাল

শুনিয়া সে উঁচু হইয়া দেখিতে যাইবে অমনি নীচে পড়িয়া গেল। রাধা নিজের প্রহারের কথা কিছু চিন্তা না করিয়া রোগীর দিকে ধাইল ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "ওগো কে আছ দেখ গো, ইনি কি রকম করছেন।" বঙ্কিম দেখিল রোগীর বিষম অবস্থা। উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া একটু ভাল হইলে বঙ্কিম নলিনীকে জোর করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিলেন ও তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। নলিনী যাইতে অস্বীকৃত হইল। অপরন্তু উভয়কে অনেক ভৎসনা ও বিস্তর গালিগালাজ করিতে লাগিল। বঙ্কিম অনেক বুঝাইলেন কিন্তু নলিনী কিছুতেও না শুনিয়া বরং উত্তরোত্তর বাড়াইতে লাগিল। আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বঙ্কিম এতদিন অত্যাচার সত্ত্বেও যা কখন করেন নাই আজ তাহাকে তাহা করিতে বাধ্য হইতে হইল। তখন নলিনী কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল রোগীর শেষ অবস্থা। অত্যধিক দুর্ব্বল অবস্থায় উচ্চ হইতে পতন হওয়ায় মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়াছে ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া বঙ্কিম তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে দৌড়াইলেন। সেখানে ঔষধ না পাওয়ায় দূরে এক বড় ডাক্তারখানায় যাইলেন। সেখান হইতে ঔষধ লইয়া আসিতে প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব হইল। আসিয়া একি দেখিলেন! রোগী একেবারে নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ! তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কে এ আর্ত্তনাদ করিতেছে! এযে রাধা! রাধার তখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই কিন্তু আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী। অভাগিনী স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে অচিন্তনীয় ঘটনার তাড়নায় বিষপান করিয়াছে।

স্বামীর ঔষধের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিষ ছিল। বঙ্কিম বারংবার তাহাকে সতর্ক করিয়াছিলেন। রাধা পৃথিবীতে থাকার আর প্রয়োজন নাই ভাবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। বঙ্কিম উন্মাদের ন্যায় বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। "রাধা! রাধা! কেন এমন কর্‌লে"? বঙ্কিমের নিকটে রাধা যেন এখন নিজের ছোট ভগ্নী। রাধা অতি কষ্টে বলিলেন "আপনার ঋণ শোধ করিবার নহে; আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, মাপ করিবেন।" এই বলিয়া রাধা চিরতরে নিস্তব্ধ হইল। বঙ্কিম জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কি ভাবে সময় কাটিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলেন না; কাহার চীৎকারে তাঁহার সাড় হইল, চাহিয়া দেখেন ভৃত্য ডাকিতেছে; "বাবু শীঘ্র আসুন, মা গলায় দড়ি দিয়াছেন।" বঙ্কিম শুনিয়া মূর্চ্ছান্বিত হইলেন।

উপরোক্ত ঘটনার ৫।৬ বৎসরের পরের কথা।—

বঙ্কিম আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। এখনও চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন কিন্তু নিজ ভরণ পোষণের যৎকিঞ্চিৎ বাদে তাহার সমস্ত আয় একটি সমিতির ভাণ্ডারে অর্পণ করেন। এ সমিতি তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমিতির ভাণ্ডার হইতে দরিদ্র গৃহস্থের কন্যাদিগের বিবাহের সাহায্য করা হয়; এই অল্প সময়ের মধ্যে উহাতে বিশ হাজার টাকা জমিয়াছে। এই সমিতিতে বিস্তর যুবক ও তাহাদের অভিবাবকগণ যোগদান করিয়াছেন, সমিতির প্রধান নিয়ম এই যে কোন অভিবাবক তাহার পুত্রের বিবাহের পণগ্রহণ করিবেন না, কিম্বা কোন যুবকই নিজ বিবাহে পণগ্রহণ ব্যাপারে সম্মত হইবেন না। এই ৫ বৎসরের মধ্যে ১৮।২০টি এরূপ ভাবে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর প্রাণে এখন ভোগজনিত সুখ নাই বটে কিন্তু কর্ত্তব্যপালনজনিত শান্তি আসিয়াছে।

The economic and social causes, which are some of the factors in the growth of crime, have been thoroughly discussed. . . . The language is elegant, dignified and intelligible to all classes of readers. The book is so lively and interesting to read that one can not but finish it at one sitting. The book will prove instructive not only to lawyers, criminologists and social-reformers, but also to the gullible and unwary people who constantly hail from moffussil for purposes of trade and education.
—*The Servant.*

The work displays erudition and acumen and arrests the attention of the readers. The author has shown considerable insight into human psychology where he portrays the gradual transformation of an artless and innocent creature into a thorough-bred heartless villain. The book has a value of its own to every kind of reader and we recommend the book especially to those who are interested in social work and to all citizens of Calcutta. The language is extremely easy, devoid of all legal technicalities and intelligible to all classes of people.
—*The Bengalee.*

---

## কয়েকটি অভিমত :—

Mr. Bhattacharyya's drama "DRONACHARYYA" is a drama of a very high order and is capable of catering to the requirements of the refined taste and culture of modern times. It appeals both to the head and heart and affords ample opportunities for artists to demonstrate effectively the inner workings of human nature. Across the mist of ages, the work conjures up visions of Ancient India and holds into lime-light a noble personality, who, with all his ability and valour, ou account of his indigent circumstances, remained unappreciated even after his demise. The book is fraught with variety and beauty in all their magnificence and gives vent to sweet and sublime sentiments in a charming manner. The book has, moreover, its value as a piece of literature. It abounds with similes and metaphors which would have done credit to the greatest poets of the age and there are plenty of passages of such philosophic value as will, for sometime, supply material for the coming generations to think over. The style and diction is also elegent and graceful. We feel quite free to recommend it to the public.—*The Amrita Bazar Patrika.*

This book, under review, is a mythological drama in five acts by an eminent lawyer. It is, indeed, an intellectual treat to follow the author's psycho-analysis by dint of which the characters have been imbued with real life and glowing personality. The theme which is well-known to the Hindu public, comprises gigantic movements amidst splendings settings in which the characters

figure as lofty individuals bent upon realising their noble aspirations. The hero, who is an embodiment of the conflict between principle and practice and is all along filled with suspense and hesitation becomes at last a victim of circumstances and a prey to iniquitious tactics of warfare in spite of his enormous powers and military skill. The language is quite dignified and suit the dignity of the theme and the book is replete with romantic adventures from start to finish.—*The Bengalee.*

It is a brilliant literary production and deserves the notice of the Bengali reading public. The author has shown much ingenuity in departing from the common-place mode of tackling mythological characters by divesting them of super-natural atmosphere with which they are generally shrouded. The interest of the reader never flags for want of sympathy with the characters who are no prodigious beings, but natural men and women like ourselves. . . . The style and manner of expression has been made quite appropriate to the characters and the situations. We hope the author will meet with adequate appreciation from the public.—*The Servant.*

The book under review is a mythological drama dealing with some of the well-known incidents, of love and of warfare, recorded in the Mahabharata. The author has, however, to a certain extent, deviated from history to free his book, as much as possible, from the super-natural element. The author's faculty of character-portrayl well deserves praise. As regards plot-construction, he has been able to make a happy blending of love

scenes and riotous scenes of war and skirmish. The drama is written all throughout in verse.—*The Forward.*

The author, in his lucid language, has pictured the whole history of the great Kurukhsetra war in short, giving prominence to the high traits of Dronacharyya's character. We have much pleasure in going through the whole book which is none the less interesting. The paper, printing and get up of the book are excellent.—*The Basumati.*

দ্রোণাচার্য্যের চরিত্র বিশ্লেষণই নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। দ্রোণচরিত্রে দুই একটী ত্রুটী ছিল ও সেই সঙ্গে তাহাতে অসামান্য উদারতা ও মহত্ত্বও জড়িত ছিল। এই সংমিশ্রণে গঠিত দ্রোণচরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। আর একটী আনন্দের কথা—সুদীর্ঘ স্বগতঃ বক্তৃতা নাটকটীতে স্থান পায় নাই যাহাতে পাঠক ও শ্রোতার মন ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠে। ছন্দ ও ভাষা ভাল হইয়াছে।—প্রবাসী

ইহা একখানি পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—পাণ্ডবগুরু আচার্য্য দ্রোণের পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার স্থানে স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পৌরাণিক চরিত্র কোথাও হীন হয় নাই। গ্রন্থকারের লিপিকৌশলে ও ভাষার লালিত্যে নাট্যোক্ত চরিত্রগুলি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা নাটকখানি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। ছাপা, বাঁধাইয়ের পক্ষে মূল্য সুলভ হইয়াছে।—আত্মশক্তি

আমরা কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ ননীলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "দ্রোণাচার্য্য" নামক পৌরাণিক নাটকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। এ নাটকে লেখকের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিষয়ে গ্রন্থকার অসামান্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার ফলে নাটকের চরিত্রগুলি সজীব ও প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে পুরাণ ও প্রচলিত [illegible]র ব্যতিক্রম করিয়া তিনি স্বকীয় কল্পনা-শক্তির আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার নাটকের ঔপাখ্যানিক শৃঙ্খলা ও মাধুর্য্যে বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অলৌকিক ঘটনাবলী বার্জ্জত করিয়া তিনি পাঠক ও দর্শকবৃন্দের পক্ষে সহজ বুদ্ধি সাহায্যে সকল বিষয় বুঝিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অ... নৈপুণ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ চরিত্রগুলি যথার্থই আদর্শস্থানীয় মানবরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা বস্তুতঃ মর্ত্ত্যলোকের ব্যতীত কোনরূপ কল্পনালোকের জীব নহেন। গ্রন্থকারের ভাষা সহজ, সরল ও ভাবব্যঞ্জক। নাটকখানি সাহিত্যসেবী দ্বারা আদৃত হইবে, আশা করি।
—পল্লীমঙ্গল

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত "বহু তথ্যে পূর্ণ" পুস্তক

# নারীর অধিকার

মূল্য চারি আনা।

দ্রষ্টব্য :—সাধারণ লাইব্রেরী ও সমিতির পক্ষে--একখানা টিকিট পাঠাইলেই বিনামূল্যে পাঠান হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে নারীর অধিকার যে বাস্তবিক ন্যায্য, বিচক্ষণ গ্রন্থকার তাহা নানা যুক্তি ও নজির প্রদর্শনে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। নারীর অধিকার যে এদেশে বাস্তবিক আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য —বৌদ্ধবাণী

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—উক্ত গ্রন্থকারের নূতন পৌরাণিক নাটক

# জরাসন্ধ

উপরোক্ত সমস্ত পুস্তক সি, টি, এজেন্সি, ১নং ডালিমতলা লেন, কলিকাতা ও গুরুদাস চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স (২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট), চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, লিমিটেড (১৫, কলেজ স্কোয়ার) প্রভৃতি কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তক-বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।